পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন ঃ মুঘল ও উপনিবেশিক আমল

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আয়শা বেগম
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক

নাজনী চৌধুরী
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
726
CHP
c. 3

Dhaka University Institutional Repository

436780

Dhaka University Institutional Repository

পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন ঃ মুঘল ও উপনিবেশিক আমল

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আয়শা বেগম
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
436780

436780

DULAP

উপস্থাপক

নাজলী চৌধুরী
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, নাজলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসাবে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন : মুঘল ও উপনিবেশিক আমল" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। মৌলিক উপকরনের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষনার ফল। আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চুড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্য প্রান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

436780

০৮.০৪.২০০৮

ড. আয়শা বেগম
প্রফেসর ও গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে " পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন: মুঘল ও উপনিবেশিক আমল" শিরোনামের এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উপর অন্য কেউ অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপণ করা হয়নি।

নাজলী চৌধুরী ৮.৪.০৮

নাজলী চৌধুরী
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

436780

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলার প্রতি বাল্যকাল হতে আমার আগ্রহ প্রবল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পড়তে এসে আনুষ্ঠানিক ভাবেই এই বিষয়ের উপর পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে যাই। এই বিভাগে পড়তে এসে বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রতি আমার যে ভাললাগার শুরু "পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন: মুঘল ও উপনিবেশিক আমল" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি তারই ফসল। তাই প্রথমেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতি যে বিভাগ আমাকে প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা বিষয়ে জ্ঞানর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

এই গবেষণা কর্মটি যার দিক নির্দেশনা পরামর্শ ও উৎসাহে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. আয়শা বেগম। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় পরম ধৈর্যের সাথে পাঠ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনের প্রতিটি ধাপে তাঁর আন্তরিক সহযোগীতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নাই।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. হাবিবা খাতুনের প্রতি যাঁর উৎসাহ, প্রেরনা ও সহযোগিতা এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সর্বক্ষণিক প্রেরণা যুগিয়েছে। এছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর পারভীন হাসান, প্রফেসর নাজমা খান মজলিস, ড. আখতারুজ্জামান, খাদেমুল হক বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয় তিনি হলেন বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ড. এনামুল হক। শুধু উৎসাহই নয় বরং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি অবাধভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে যেয়ে আমাকে বেশ কিছু গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলো হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারের আবু মুহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার , এম. আর. তরফদার স্মৃতি জাদুঘর সংগ্রহশালা, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গ্রন্থাগার , বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস গ্রন্থাগার, শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার ও পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গ্রন্থগার। এই সকল গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধু মাসুদ রানা খান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য সরবারহ করে এবং অভিসন্দর্ভটি দাখিলে প্রশাসনিক জটিলতা সমাধানে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আমি আন্তরিক ভাবে তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধেয় জনাব আব্দুল আলিম ফার্সি ভাষায় লিখিত শিলালিপিগুলোর কিছু ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়ে আমাকে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা শুধু গ্রন্থাগারে বসে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এর জন্য চাই বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরিপকার্য চালানোর মত এই দুরহ কাজটি সম্পাদনে সহযোগীতার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার মা-বাবা, ভাই-বোনসহ পরিবারের প্রতিটি সদস্যর নিকট কৃতজ্ঞ। এ ব্যপারে আমি সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা পেয়েছি আমার স্বামী, ট্রাডিশনাল ফটো গ্যালারীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও ফটো সাংবাদিক বাবু আহমেদের কাছ থেকে। তিনি বাস্তব পর্যবেক্ষণে কাজে শুধু আমাকে সঙ্গই দেননি বেশ কিছু স্থাপত্যের ছবিও সরবারহ করেছেন তাই আমি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নাজলী চৌধুরী
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সুচীপত্র

অভিজ্ঞান পত্র ii
অঙ্গিকার পত্র iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

ভূমিকা vii
তালিকা : মানচিত্র, ভূমি-নকশা ও আলোকচিত্র xv

- প্রথম অধ্যায় ১
  ঐতিহাসিক পটভূমি
- দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮
  স্থাপত্য নিদর্শন: মুঘল আমল
  ক.মসজিদ ২১
  খ. মন্দির ৩৩
- তৃতীয় অধ্যায় ৩৮
  স্থাপত্য নিদর্শন: উপনিবেশিক আমল
  ক. মসজিদ ৪০
  খ. মন্দির ৫৩
  গ. জমিদারবাড়ি ৭৩
  ঘ. অন্যান্য ৮৫
- চতুর্থ অধ্যায় ৯০
  উপসংহার
- পরিভাষা
- মানচিত্র
- ভূমি-নকশা
- আলোকচিত্র
- গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন "যদি প্রত্যেক জেলার গ্রামগুলোর কাহিনী সংগৃহিত হয় তাহলে একদিন বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হতে পারে" বাংলার প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক জীবন, ধর্মীয় ধ্যান-ধারনা সর্বপরি রাজনৈতিক অবস্থা সেই অঞ্চলের স্থাপত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হতে পারে। তাই বাংলার প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে,বাংলার ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গতা দিতে হলে আঞ্চলিক স্থাপত্যের চর্চা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান 'পাবনার স্থাপত্য নিদর্শন: মুঘল ও উপনিবেশিক আমল' শীর্ষক এই গবেষণা কর্মটি এ অঞ্চলের এবং একই সাথে বাংলার স্থাপত্য ইতিহাসকে পুণরুদ্ধার করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।

প্রাচীনকাল হতেই পাবনা একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসবে ইতিহাস খ্যাত। অন্তত: পক্ষে গুপ্ত আমল হতে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে পাবনা অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহর সময় হতে সুলতান নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহর সময় কাল পর্যন্ত পাবনা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নৌঘাটি ছিল তার প্রমাণ শিলালিপিতে রয়েছে। মুঘল আমলের প্রাথমিক পর্যায়ে মাসুম খান কাবুলী এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন। মুঘল শাসনের অধীনেও পাবনা গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটি ছিল। মূলত: ভৌগলিক অবস্থান পাবনা অঞ্চলকে সবসময়ই সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা দান করেছে। উপনিবেশিক শাসনামলে পাবনা বাংলার বৃহত্তম নাটোর জমিদারীর অন্তর্ভক্ত ছিল। পাবনা শুধু সামরিক দিক দিয়েই নয় বাণিজ্যিক কারণেও বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে পরিগণিত হত। বস্ত্র উৎপাদনকারী কেন্দ্র হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা অঞ্চলের প্রসিদ্ধি আজও বর্তমান । পাবনা জেলার হান্ডিয়াল একসময় প্রসিদ্ধ বানিজ্য কেন্দ্র ছিল। বুকানন হ্যামিলটন তাঁর *ইষ্ট ইন্ডিয়া গেজেসিয়ারস* (১৮২৮) 'এ একে 'হাঁড়িয়াল' বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এটা তৎকালিন রাজশাহী জেলার তিনটি প্রধান শহরের একটি যা "Used to produce four fifth of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from Hindustan... A commercial mart where the East India Company has long had an established factory for the purchasing of silk and cotton goods"

সামরিক গুরুত্ব ও বানিজ্যিক সমৃদ্ধি এই অঞ্চলে জনসমাগমের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐহ্যিক স্থাপত্য। ১৮৩৭ সালে পাবনা হতে ৪ মাইল পশ্চিমে পদ্মাগর্ভে চারটি প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া যায়। বেলে পাথরের তৈরী এই স্তম্ভ গুলির গঠন ও অলংকরণ হতে এগুলো একাদশ- দ্বাদশ শতকের নির্মাণ বলে মনে করা হয়। বর্তমানে এই প্রস্তর স্তম্ভ গুলো ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ক্যালকাটায় রক্ষিত আছে।এ ছাড়া পাবনা জেলার সন্নিকটে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার নিমগাছী, ক্ষিরতলা ও ভূয়াট মৌজার এক বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে বহু ধ্বংস স্তুপ রয়েছে। নিমগাছি হতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হতে পাল আমলে 'পাহিল' নামে এই অঞ্চলের একজন রাজার নামও পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে মুসলিম পূর্ব যুগ হতেই এই অঞ্চলে স্থাপত্যিক ঐশ্বর্য্য ছিল।

মুসলিম শাসনামলে এই অঞ্চলের প্রাচীনতম টিকে থাকা ইমারত হল শাহজাদপুরের (বর্তমান সিরাজ গঞ্জ জেলা) মখদুম শাহ দৌলা শহীদের মসজিদ। পনের গম্বুজ সম্বলিত স্বল্প বাঁকানো কর্ণিশের এই মসজিদের নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ বলে মনে করা হয়। এছাড়া তাড়াশ উপজেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা) নওগাঁয় একুশ গম্বুজ সম্বলিত ভাঙ্গা মসজিদের ভগ্নাংশ আজও বিদ্যমান। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১৪৫৪ সালে নির্মিত। একই গ্রামের ১৫২৬ সালে নির্মিত নবগ্রাম শাহী মসজিদ, চাটমোহর থানার সমাজ গ্রামে ১৫৫২ সালে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ শাহী মসজিদ, ১৫৮১ সালে চাটমোহরে নির্মিত শাহী মসজিদ ইত্যাদি পাবনা অঞ্চলের প্রাচীন মসজিদ হিসাবে পরিগনিত হয়। মন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধি রয়েছে। পাবনা অঞ্চলের হান্ডিয়ালে অবস্থিত জগন্নাথের মন্দিরটি এই অঞ্চলের প্রাচীনতম টিকে থাকা মন্দির বলে ধরা হয়। মন্দির গাত্রের একটি শিলালিপি হতে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৫৯০ সালে সংস্কার করা হয়। শিলালিপির সাক্ষে মন্দিরটি বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলোর অন্যতম বলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া তাড়াশ উপজেলার মন্দির গুচ্ছও প্রাচীনত্ব ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব্যের দিক দিয়ে বাংলার মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

মুঘল ও উপনিবেশিক শাসনামলেও পাবনা অঞ্চলে পোতাজিয়া নবরত্ন, হাটিকুমরুল নবরত্ন, জোড় বাংলা, শেঠের বাংলা ইত্যাদির মত বিখ্যাত মন্দির স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে। হাটিকুমরুলের নবরত্ন মন্দিরটি বাংলার সর্ববৃহৎ নবরত্ন মন্দির এবং পাবনার জোড়া বাংলা মন্দিরটিও বাংলায় নির্মিত জোড় বাংলা মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। শুধু মন্দির বা মসজিদ স্থাপত্যই নয় মুঘল আমলের শেষের দিকে ও উপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম পর্যায়ে গড়ে উঠা জমিদারদের প্রাসাদপম বাসগৃহের জাঁকজমক ও শৌর্যের রেশ এখনও মানুষকে আকৃষ্ট করে।

পাবনা জেলা সম্পর্কিত তথ্য বহুল গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী না। ১৮৭৬ সালে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টারের *এ ষ্ট্যাসিষ্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল ডিষ্ট্রিকট (মুর্শিদাবাদ এন্ড পাবনা)* এই জরিপ প্রতিবেদনটি পাবনার শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজস্ব, জনবসতি, ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে প্রথম তথ্য বহুল গ্রন্থ তবে প্রতিবেদনটিতে পাবনা অঞ্চলের ঐতিহাসিক ইমারত সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। ১৮৯৫ সালে বৃটিশদের দ্বারা প্রথমবারের মত বাংলার কিছু সংখ্যক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করা হয়। *লিষ্ট অব এনশিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল রিভাইসড এ্যান্ড কারেকটেড আপ টু থারটি ফারষ্ট অগস্ট ১৮৯৫*, শিরোনামের এই প্রতিবেদনটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটাই আজ পর্যন্ত সম্পাদিত বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রথম ও তথ্যভিত্তিক জরিপ কাজ বলে স্বীকৃত। এতে জেলা ভিত্তিক প্রত্নইমারত ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৮৯৫ সালের এই জরিপ প্রতিবেদনে পাবনা স্থলে "none" উল্লেখিত হয়েছে । ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ও'মাইলীর *বেঙ্গল ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ারস (পাবনা)* এ পাবনা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই স্থানের দু একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের উল্লেখ খুবই সংক্ষেপে করা হয়। মূলত: বৃটিশ শাসনামলে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে মুঘল পরবর্তী ইমারতগুলো তাদের ইমারত তালিকা থেকে বাদ পরে যায়। এ সময় প্রাক মুসলিম ও মুসলিম (সুলতানী ও মুঘল) স্থাপত্যের সংরক্ষণ এত বেশী জরুরী ছিল যে সম্ভবত: মুঘল পরবর্তী স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর তালিকাভুক্তিকরণ ও এদের সংরক্ষণ করা তাদের দৃষ্টিতে জরুরী বলে মনে হয়নি। ১৯৩৪ সালে *পাবনা জেলার ইতিহাস* প্রনেতা রাধা রমন সাহা তার গ্রন্থে বৃহত্তর পাবনা জেলার স্থাপত্য সম্বন্ধে আলাদা একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। এতে বিজ্ঞান সম্বতভাবে না হলেও লেখক পাবনার বেশ কিছু ইমারতের যথাসম্ভব বর্ণনা, শিলালিপির অনুবাদ ও প্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখের চেষ্টা করেছেন। তবে প্রকৃত চিত্রের তুলনায় এই সংখ্যা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত আহমাদ হাসান দানীর *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল* এ পাবনা জেলার মাত্র তিনটি ইমারত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শামসুদ্দীন আহমেদের ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *ইনসক্রিপশন অব বেঙ্গল* (ভলিউম ফোর) এ পাবনা জেলার দুটি মসজিদের শিলালিপির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ মসজিদগুলো সমন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে রচিত হয় *চলন বিলের ইতিকথা* , এম. এ. হামিদ রচিত এই গ্রন্থে পাবনার চলন বিল অঞ্চলের স্থাপত্য নিয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে, তবে চলন বিল অঞ্চলের বাইরে স্থাপত্যগুলো প্রাসঙ্গিক ভাবেই আলোচনায় আসেনি। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় ডেভিড ম্যাক্কাচিয়নের *লেট মিডাইভাল টেম্পল্স অব বেঙ্গল* এই বইয়ে ম্যাক্কাচিয়ন বাংলার মন্দির সমূহের তালিকা ও শ্রেনীকরণ কারেছেন। এই বইয়ে পাবনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আ. কা. ম. যাকারিয়ার *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* বইটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে জেলা ভিত্তিক ভাবে বাংলাদেশের প্রত্নস্থল ও ইমারতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে পাবনা জেলার সর্বসাকুল্যে ১৩টি প্রত্নস্থলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। ১৯৮৬ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা *জিলা পাবনার ইতিহাস* রচনা করেন। এতে পাবনা জেলার কিছু ইমরতের বর্ণনা থাকলেও এই বইয়ে কিংবদন্তি ভিত্তিক বর্ণনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় সেই সাথে বর্ণনায়ও যথেষ্ট পরিমানে অসম্পুর্ণতা রয়েছে। ১৯৯০ সালে পাবনার অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর শতবর্ষপূর্তী উপলক্ষে প্রকাশিত *শতবর্ষ স্মরনিকায়* আবদুল মান্নান তালুকদার রচিত 'প্রবাদ জনশ্রুতি কিংবদন্তীর আবর্তে পাবনা জেলার পুরাকীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে পাবনা জেলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। পাবনার দু'একটি স্থাপত্য নিয়ে বিভিন্ন গবেষনা গ্রন্থে ও সাধারন নিবন্ধে প্রসঙ্গিক ভাবে আলোচনা হলেও আয়শা বেগম ৯০' এর দশকে পাবনার বিশেষ বিশেষ স্থাপত্য নিয়ে সম্পর্ণ গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো হল *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত 'পাবনার জোড় বাংলা মন্দির', *শিল্পকলা পত্রিকা* ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'চাটমোহর মসজিদ: বাংলার স্থাপত্য শিল্পে যুগসন্ধিলগ্নের নিদর্শন', ১৯৯০ সালের প্রকাশিত *আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ* ও *জার্নাল অব বেঙ্গল আর্ট* ১৯৯৬ এ প্রকাশিত 'দ্যা মস্ক অব বদরুদ্দীন: এ রেয়ার টাইপ অব টু ডোমড্ মস্ক'।

১৯৯৭ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পাবনা অঞ্চলের উপর একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন একটি জরিপের প্রকাশিত রূপ হলেও পাবনা অঞ্চলের বহু গুরুত্বপূর্ণ ইমারত এই প্রতিবেদনে তালিকাভুক্ত হয়নি। ২০০২ সালে প্রকাশিত ড: আয়শা বেগমের *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত* এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের এক গ্রহণযোগ্য সংকলন।

মুঘল আমলে পাবনা বলে কোন স্বতন্ত্র জেলা ছিল না । উপনিবেশিক শাসনামলে ১৮২৮ সালে প্রথম রাজশাহী থেকে খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, মাথুরা, ও পাবনা এই পাঁচটি থানা

Dhaka University Institutional Repository

ও যশোর জেলা থেকে ধর্মপুর (পাংশা), কুষ্টিয়া ও মধুপুর থানা নিয়ে প্রথম পাবনা জেলা গঠন করা হয়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে সিরাজগঞ্জ থানাকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে কেটে পাবনা জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এর পরের প্রায় ৫০ বছর যাবৎ চলে পাবনার সীমা পরিবর্তন। সর্বশেষ সীমা পরিবর্তন হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই বছর প্রশাসনিক পূর্ণ বিন্যাসের ফলে পাবনা জেলাকে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এই দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। সীমা নির্ধারণগত জটিলতা এড়াতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি নবগঠিত পাবনা জেলার মধ্যে এবং গবেষণার বিষয়বস্তু মুঘল ও উপনিবেশিক স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এখানে সেই সমস্ত স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে মুঘল বা উপনিবেশিক স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও পরিলক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ ভাবে পূণঃনির্মিত স্থাপত্য নিদর্শন এই গবেষণার আওতায় আনা হয়নি। পাবনার ঐতিহাসিক স্থাপত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলার স্থাপত্য রীতির ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান এই গবেষণা কর্মের অন্ত:র্ভূক্ত।

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক পটভূমি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে পাবনায় অবস্থিত মুঘল ও উপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:

এখানে বাংলার ইতিহাসে পাবনা জেলার অবস্থান আলোচিত হয়েছে। ১৮২৮ সালের পূর্বে পাবনা বলে কোন জেলার অস্তিত্ব না থাকায় পাবনা জেলার বর্তমান অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাচীনকাল হতে পাবনা অঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে এ অধ্যায়ে পাবনা অঞ্চলের ইতিহাস পূণঃগঠনের চেষ্টার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত সীমার আলোকে পাবনা জেলার বর্তমান সীমা ও অবস্থান এই অধ্যায়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে মুঘল শাসনামলে পাবনা জেলায় নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্য (মসজিদ, মন্দির) , তাদের অবস্থান, বর্ণনা, অলংকরণ, নির্মাণকাল, শিলালিপি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে উপনিবেশিক শাসনামলে পাবনা জেলায় নির্মিত মসজিদ, মন্দির, জমিদারবাড়ি সহ অন্যান্য স্থাপত্য আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এটি মূলতঃ একটি মূল্যায়ন মূলক অধ্যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহের সারাংশ বিচার-বিশ্লেষনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে উপসংহার আকারে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণায় দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

১. পূর্বপ্রকাশিত ও লিখিত তথ্যের বিশ্লেষণ।

২. মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ।

১. পূর্ব প্রকাশিত ও লিখিত তথ্যর বিশ্লেষণ:

গবেষণার এই পর্যায়ে প্রথমে বিভিন্ন গ্রন্থ ,আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদন সহ অন্যান্য প্রতিবেদন, গেজেটিয়ারস, স্মরণিকা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন দলিলের মধ্যে উল্লেখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পর সংগৃহিত তথ্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুধু যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত তথ্যই গ্রহন করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অথচ দুস্প্রাপ্য তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত দলিল দস্তাবেজের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থের দূস্প্রাপ্যতা হেতু পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থ হতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ:

গবেষণার এই পর্যায়ে অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত সকল প্রত্নস্থলে গিয়ে সরেজমিনে স্থাপত্যের অবস্থান, মাপ, চিত্র, বিভিন্ন কিংবদন্তি , শিলালিপির ছাপ সংগ্রহ ইত্যাদি তথ্য সংকলিত করে বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য স্থানীয় জনগনের সাক্ষাতকারও গ্রহন করা হয়েছে। জরিপে সংগৃহিত মাপ ও পূর্বপ্রকাশিত মাপের মধ্যে তুলনা করে যৌক্তিক মাপটি গ্রহন করা হয়েছে। শিলালিপিগুলোর ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রকাশিত শিলালিপির বিশুদ্ধ পাঠটি গ্রহন করা হয়েছে এবং অপ্রকাশিত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। স্থাপত্যের ভূমি নক্শার ক্ষেত্রে পূব-প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য মাপ যৌক্তিকতার বিচারে গ্রহন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র, ভূমি-নকশা ও আলোকচিত্রের তালিকা

মানচিত্র:

১. বাংলাদেশের মানচিত্রে পাবনা জেলার অবস্থান।
২. পাবনা জেলার মানচিত্র, পরিবর্তিত সীমারেখা (১৮২৮-১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ)।
৩. বৃহত্তর পাবনা জেলার মানচিত্র।
৪. নবগঠিত পাবনা জেলার মানচিত্র।
৫. পাবনা জেলার মানচিত্রে মুঘল ও ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্যের অবস্থান।

ভূমি-নকশা:

১. চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর
২. ভাড়ারা শাহী মসজিদ, পাবনা সদর
৩. জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা সদর
৪. বেরোয়ান মসজিদ, আটঘরিয়া
৫. সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ, পাবনা সদর
৬. দুলাই জামে মসজিদ, সুজানগর
৭. শেঠের বাংলা মন্দির, হান্ডিয়াল, চাটমোহর
৮. বোঁথর শিব মন্দির, চাটমোহর
৯. তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির, সুজানগর

আলোকচিত্র:

১. চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর
২. শিলালিপি, চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর
৩. বালুচর গম্বুজ ঘর, চাটমোহর
৪. পাইকপাড়া মসজিদ, হান্ডিয়াল, চাটমোহর
৫. বুড়া পীরের মাজার, হান্ডিয়াল চাটমোহর
৬. ভাড়ারা শাহী মসজিদ, দোগাছি, পাবনা সদর
৭. দোচালা প্রবেশপথ, ভাড়ারা শাহী মসজিদ
৮. শিলালিপি, ভাড়ারা শাহী মসজিদ
৯. জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা সদর
১০. অলংকরণ, জোড়-বাংলা মন্দির
১১. বেরোয়ান মসজিদ, আটঘরিয়া
১২. শিলালিপি, বেরোয়ান মসজিদ
১৩. মৃধার মসজিদ, আটঘরিয়া
১৪. খানবাড়ি মসজিদ, আটঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৫. দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ, পাবনা সদর
১৫ক. মিহরাবের বাইরের অলংকরণ, দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ
১৬. সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ, পাবনা সদর
১৭. শিলালিপি, সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ
১৮. দুলাই জামে মসজিদ, সুজানগর
১৯. শিলালিপি, দুলাই জামে মসজিদ
২০. শেঠের বাংলা মন্দির, হান্ডিয়াল, চাটমোহর
২১. অলংকরণ, শেঠের বাংলা মন্দির
২২. বোঁথর শিব মন্দির, চাটমোহর
২৩. কুমারপাড়া বৈদ্যনাথের মন্দির, চাটমোহর
২৪. বিশ্বাসবাড়ি মন্দির, চাটমোহর
২৫. ঠাকুরবাড়ি মঠ, ফরিদপুর
২৬. নেছড়াপাড়া মঠ, ফরিদপুর
২৭. গোসাইবাড়ি মন্দির, পাবনা সদর
২৮. হেমরাজপুর শিব মন্দির, সুজানগর
২৯. গণেশ মন্দির, সাথিয়া
৩০. পয়দা পঞ্চরত্ন মন্দির, পাবনা সদর
৩১. পয়দা আহ্নিক মন্দির, পাবনা সদর
৩২. তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির, সুজানগর
৩৩. তাঁতীবন্দ একরত্ন মন্দির, সুজানগর
৩৪. তাঁতীবন্দ শিব মন্দির, সুজানগর
৩৫. দুলাই জমিদারবাড়ি, সুজানগর
৩৬. শিতলাই জমিদারবাড়ি, পাবনা সদর
৩৭. তাড়াশ রাজবাড়ি. পাবনা সদর
৩৮. বনওয়ারী নগর রাজবাড়ি, ফরিদপুর
৩৯. জোতকলসা বাংলাঘর, আটঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমান পাবনা জেলা প্রাচীনযুগে পূর্ব ভারতের পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অংশ ছিল।[১] প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং হিউয়েং সাং এর বর্ণনার ভিত্তিতে পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করেন [২]। তবে মৌর্য ও মৌর্যপরবর্তী শক ও কুশাণ আমলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহকারী তেমন কোন প্রমাণিক উপাদান এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে (৩৪০-৮০ খ্রী.) প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত শাসনামলে বিশেষ করে কুমারগুপ্তের শাসনামল হতে একেবারে ষষ্ঠশতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্ত রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র। এই রাষ্ট্রবিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত যে, সম্রটে স্বয়ং বিষায়পতি নিযুক্ত করতেন। অষ্টমশতকের প্রারম্ভে কনৌজ রাজ যশোবর্মণ গৌড় জয় করেন। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার নিমগাছী হতে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ভট্টাল দেশের শাসক কর্করাজ যশোবর্মনের মিত্র ছিলেন ।[৩] যশোবর্ধনের সভাকবি বাকপতি রচিত গৌড়বাহ হতে জানা যায় যশোবর্ধন গৌড় ও মগধাপতিকে পরাজিত করে পূর্বদিকে অগ্রসর হন ও বঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে পাবনা সেই সময়ও পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভূক্ত ছিল কিন্তু এর অবস্থান ছিল একেবারে বঙ্গের সীমান্তে ।[৪] অষ্টমশতকের মাঝামাঝি সময়ে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা বাংলার রাজনৈতিক ও স্থাপত্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাল বংশের প্রায় ১৭ জন রাজা বাংলা শাসন করেন। তাদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহেন্দ্রপাল ও শূর পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালের শাসনামলে নওগাঁর পাহাড়পুর অঞ্চলে সোমপুর নামে যে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বাংলার পরবর্তী স্থাপত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। পাবনা জেলার নিমগাছী হতে পাল সম্রাট দেবপালের

Dhaka University Institutional Repository

সময় কালের যে শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে তাতে পাহিল নামের একজন শাসকের নাম পাওয়া যায়। পাহিল ছিলেন পূর্ব উল্লেখিত কর্করাজের পৌত্র ও শিবরুদ্রের পুত্র। এই লিপিতে পুন্ড্রবর্ধনভূক্তির একটি মন্ডল ভট্টালদেশকে সমৃদ্ধ ও পাপ মুক্ত স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] একাদশ শতকের শেষের দিকে কৈবর্তগণ পাল সম্রাট ২য় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্রী দখল করে নেয়।[৬]। কৈবর্ত শাসক ভীম কর্তৃক এ সময় চলনবিলের উত্তর সীমান্তে ও সিরাজগঞ্জ থেকে শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মৃত্তিকা প্রাকার নির্মাণ করেন যা এখনও ভীমের জাঙ্গাল নামে পরিচিত।[৭] ভ্যানডান ব্রুকের মানচিত্রে পাবনা জেলার হান্ডিয়াল ও তাড়াশের মধ্য দিয়ে উত্তরে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত ও আরও উত্তরে বিস্তৃত রাস্তাকেই ভীমের জাঙ্গাল হিসাবে দেখানো হয়েছে।[৮] সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিতে পাল শাসনের শেষপর্যায়ে যে সমস্ত রাজা ও সামন্তদের তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, তদানিন্তন বাঙলা ও বিহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিছিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। নীহারঞ্জন রায় এই তালিকার অন্তর্ভূক্ত পাদুম্বাকে পাবনা জেলার সাথে অভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।[৯] একাদশ-দ্বাদশ শতকে পাল রাজাদের পরাজিত করে সেন রাজাগণ বাংলা দখল করেন। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলার মাধাই নগর হতে লক্ষণসেনের শাসনামলের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এটি লক্ষনসেনের রাজত্বকালের ২৫তম বছরে উৎকীর্ণ (১১৭৮+২৫=১২০৩)। এই তাম্রফলকে জনৈক শ্রী নারায়ণ ভট্টারককে দাপুনিয়া পট্টক নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ রয়েছে ।[১০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাবনা জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এখনও দাপুনিয়া নামে একটি গ্রামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ১৮৩৭ সালে পাবনার ৪ মাইল পশ্চিমে পদ্মাগর্ভ হতে যে চারটি প্রস্তরস্তম্ভ উদ্ধার করা হয় , অলংকরণ বিচারে এদেরকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের নির্মাণ বলে মনে করা হয়।[১১] এই স্থান হতে প্রত্ননিদর্শনের প্রাপ্তি পাবনার এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের পরিচয় বাহক।

১২০৪[১২] সালে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মধ্যদিয়ে সেন তথা হিন্দু- বৌদ্ধ শাসনের অবসান হয় ও মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এই বিজয়ের ফলে সম্ভবতঃ পাবনা সহ সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। বখতিয়ার খলজীর শাসনামলে মুসলিম বাংলার রাজধানী ছিল দেবকোটে। তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর বখতিয়ার দেবকোটেই ১২০৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সময় মুসলিম বিজিত রাজ্যে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩] তবে তাঁর আমলে নির্মিত কোন স্থাপত্য নিদর্শন বর্তমানে আর টিকে নাই। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ শীরন খলজী শাসন ক্ষমতায় বসেন (১২০৬ খ্রি.) কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শীরন খলজী অপসারিত হন ও হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী দেবকোটে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইওজ খলজী দুই বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর আলী মর্দান আলা-উদ-দীন খলজী উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন, ১২১২ খ্রি. আলী মর্দান খলজী হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজীর নেতৃত্বে আমীরদের দ্বারা নিহত হন। হুসাম উদ্দিন গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজী উপাধী ধারন করে সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজীই সর্ব প্রথম রাজকীয় উপাধি গ্রহন করেন এবং স্বীয় মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নামও অঙ্কন করেন। ১২২৭ খ্রি. ইলত্যুৎমিশের পুত্র নাসির উদ্দিনের নিকট তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মিনহাজ ৬৪১ হিজরীতে লাখনৌতি রাজ্যে আগমন করলে ইওজ খলজী বহু ইবাদত খানা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত সুকার্যের নিদর্শন রাজ্যের সর্বত্র দেখতে পান।[১৪] বর্তমান এই সকল ইমারতের কোন কিছুই টিকে নাই। বীরভুম জেলার সিয়ামে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হতে ১২২১ খ্রি. ঐ অঞ্চলে একটি খানকা নির্মাণের কথা জানা যায়।[১৫] আবিস্কৃত শিলালিপির মধ্যে এটাই বাংলার মুসলমান শাসকদের প্রাপ্ত প্রথম শিলালিপি।

গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজীর মৃত্যুর পর বাংলার শাসন দিল্লী সালতানাতের অধীন হয়ে পরে। তবে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট যে ১৬ জন শাসনকর্তা লক্ষণাবতী শাসন করেন তাদের কেউ কেউ নিজেদের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন। সুলতান মুগীজ উদ্দীন তুঘরিল তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। তুঘরিল ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াস

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন বলবনের নিকট পরাজিত হন। এর পর বলবনের পুত্র বুগরা খাঁন লাখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু বুগরা খান ও স্বাধীনতা ঘোষনা করেন এবং নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ উপাধি ধারন করেন। পরবর্তী ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে এবং ঐ বছর সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলক লাখনৌতি তার সাম্রাজ্য ভুক্ত করে নেন।

দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে হাজী ইলিয়াস নামের জনৈক ব্যক্তি ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে লাখনৌতির সিংহাসন দখল করেন এবং সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে স্বাধীন বাঙালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পাবনা জেলার ইতিহাস প্রণেতা রাধারমন সাহা বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা স্বীয় অধিকারভুক্ত রাখার জন্য যে সমস্ত হিন্দু জমিদারদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে ভাদুরী ও সান্ন্যালগণ ছিলেন প্রধান। এদের জায়গীর যথাক্রমে চলনবিলের উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।[১৬] রাধা রমন সাহার এই বর্ণনা প্রশ্নাতীত না হলেও পরবর্তী কালে ভাতুরিয়া পরগনার রাজা, রাজা গণেশ[১৭] যে বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। মেজর রেনেলের মানচিত্রে পাবনার অধিকাংশ স্থান ভাতুরিয়ার অন্তর্গত দেখান হয়েছে। [১৮] পাবনা জেলার চাটমোহরের কতকাংশ এখনও ভাতুরিয়া নামে পরিচিত। *Bengal District Gazetteer Rajshahi 1916* এ উল্লেখ আছে "Bhaturia is still the designation of a pargana ...but the name is given to the country on the both sides of the Atrai river, its boundary being the river Mahananda and its tributary Punnarbhaba on the west, the Ganges on the south, the Karatoya on the east and Dinajpur on the north practically the present district of Rajshahi (and part of Pabna)"[১৯]

ইলিয়াস শাহর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রিষ্টাব্দ), গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ), সাইফুদ্দীন হামযা শাহ (১৪০৯-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ),

Dhaka University Institutional Repository

শিহাব উদ্দীন বায়জিদ শাহ (১৪১২-১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ), ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ)এ জেলার উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন।

১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটিয়ে ভাতুরিয়া পরগণার রাজা গণেশ [২০] বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন। রাজা গনেশের উত্থানের ফলে বাংলার মুসলিম শাসনের মধ্যে একটি ছেদ সৃষ্টি হয় এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বাংলার হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তার পুত্র যদু (১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ / ৮২১ হিজরী) যিনি গণেশের জীবিত অবস্থায় ও একবার সিংহাসনে বসে ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলেন জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে পূণ: আরোহন করেন। ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল সহ সমগ্র বাংলার উপর তাঁর শাসন ক্ষমতা অব্যহত থাকে। জালাল উদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২-১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহন করেন।

১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর শামসুদ্দীন আহম্দ শাহকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তিনি আবুল মুজাফ্ফার নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ নাম ধারন করেন। বৃহত্তর পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) তাড়াশ উপজেলার নবগ্রাম হতে নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর শাসনামলের একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। উক্ত লিপিতে সিমলাবাদ নামে একটি 'খিত্তা' বা সুরক্ষিত শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর সময় সিমলাবাদ ছিল একটি গুরুত্তপূর্ণ প্রশাসনিক একক।[২১]

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহর মৃত্যুর পর যথাক্রমে রুকনুদ্দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) ও জালাল উদ্দীন ফাতেশাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলা শাসন করেন।

১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতা আবিসিনিয় ক্রীতদাসদের হাতে চলে যায়। আবিসিনিয় শেষ শাসক শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহকে হত্যা করে তাঁর উজির আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উপাধি ধারন করে ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করে

Dhaka University Institutional Repository

হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবিসিনিয় শাসকদের শাসনামলে বাংলায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তার অবসান ঘটান এবং দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এসময় দেশে রাজনৈতিক সম্প্রীতি, বিস্তৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বৃহত্তর পাবনা (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) জেলার তাড়াশ উপজেলার নবগ্রাম হতে নসরৎ শাহর সময়কালের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যেখানে জানদার ও মীর-ই-বহর ইত্যাদি উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নাম পাওয়া যায় যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, নসরত শাহর সময় পাবনা অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি ছিল এবং এটি একটি নৌঘাটি হিসাবে ও সুলতানী আমলে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করত। [২২] নসরৎশাহর মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ উত্তরাধিকারী হন। এরপর বিহারের আফগান নেতা ও পরবর্তী দিল্লীর সুলতান শের শাহ শূরী (১৫৩৯-১৫৪৫) কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ শাহর রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) এ জেলার উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। পাবনা জেলার চাটমোহর থানার সমাজ গ্রাম হতে ইসলাম শাহর সময় কালের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। [২৩] ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তা শূর বংশীয় মাহমুদ খান শূর স্বাধীনতা ঘোষনা করেন এবং শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজী (১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) উপাধি ধারণ করেন। মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সুলতান আদিল শাহর নিকট ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হন এবং আদিল শাহর প্রতিনিধি শাহবাজ খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুহম্মদ শাহর পুত্র খিজির খাঁর নিকট পরাজিত হন। তিনি গিয়াস উদ্দিন বাহদুর শাহ নাম ধারণ করে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কররানী বংশীয় আফগান তাজখান কররানী তৃতীয় গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে বাংলার কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাজখানের মৃত্যুর পর তার ভাই

Dhaka University Institutional Repository

সুলাইমান কররানী বাংলার ক্ষমতায় আসেন। সোলায়মান বাংলা বিহারের সার্বভৌম নৃস্পতি হওয়া সত্ত্বেও সুলতান উপাধি গ্রহন করেন নাই। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুন:রুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুমায়ূনের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠান। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে সোলায়মান কররানী আকবরের নামে খুতবা পাঠ করতেন এবং মুদ্রা জারি করেন। [২৪] সোলায়মান করবানীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় বায়জিদ ও দাউদ নিজেদের নামে খুতবা পাঠ করান। [২৫] দায়ুদ খাঁন কররানী সময় বাংলা বিহার আফগান বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুঘল সেনাপতি মুনিম খান ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে কররানীদের রাজধানী তান্ডা দখল করে নেন এবং বাংলায় মুঘল কর্তৃত্বের সূচনা ঘটে। কিন্তু আফগান শক্তির পতন হলে ও আফগান সেনানায়ক এবং বাংলার ভূইঞা জমিদার ও সামন্ত প্রধানরা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর দীন-ই-এলাহী নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। প্রায় একই সময়ে আকবরের অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক ঘোড়ায় দাগ দেওয়ার নীতি (Branding regulation) প্রবর্তন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থানরত সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দেওয়া ও জায়গীর ভুমি রাজস্বের হিসাব নিরীক্ষণে কড়াকড়ি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে মুঘল সৈনিক ও সেনাপতিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অসন্তোষ বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিদ্রোহীগণ কাবুলের শাসনকর্তা ও সম্রাট আকবরের ভাই মীর্জা হাকিমের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকে, ১৫৮০ সালে বিদ্রোহীগণ বাংলার মুঘল গভর্ণর মোজাফফর খান তুরবতীকে হত্যা করে এবং মীর্জা হাকিমের নামে খুতবা পাঠ করা হয়। উপাধি, খিলাত ও জায়গীর প্রত্যেকের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয় এবং মাসুম খান কাবুলী মীর্জা হাকিমের পক্ষে উকীল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হন; তার উপাধি হয় খান দৌরান।[২৬] মাসুম খান কাবুলীর জায়গীর ছিল চাটমোহর কেন্দ্রীক। এখানেই তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেছিলেন বলে মনে হয়। চাটমোহর শাহী মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, মাসুম খান কাবুলী সুলতান উল আযম উমাদাত উস সাদাত

Dhaka University Institutional Repository

(বড় সুলতান এবং সৈয়দের নেতা) আবুল ফতহ মুহম্মদ মাসুম খান কাবুলী উপাধি গ্রহন করেন।[২৭] মাসুম খান তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিরযা মোমিন মসনদে-ই-আলা ঈশা খানের পুত্র মুসা খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

ইসলাম খান চিশতী ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৫৭৬ থেকে ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত মোট নয়জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন এবং এ সময় বাংলায় মুঘল অধিকৃত এলাকা পশ্চিমে রাজমহল, পূর্বে বগুড়ার শেরপুর মুর্চা, উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে সাতগাঁও এবং বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [২৮] ইসলাম খানের পূর্বে কুতব-উদ-দীন খান কোকা ও জাহাঙ্গীর কুলী খান (১৬০৬-১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত থাকলেও বাংলায় মুঘল সম্প্রসারণে তারা তেমন কোন অবদান রাখতে পারেন নাই, ইসলাম খান বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে পৌছেই বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদারদের আনুগত্য আদায় করেন। এরপর তিনি ভুষনার জমিদার শত্রুজিতকে পরাজিত করেন। এসময় মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সোনাবাজু, ভাতুরিয়াবাজু, ইউসুফশাহী ও চাঁদপ্রতাপের জমিদারদের সংঘর্ষ হয়। ইতিপূর্বে সোনাবাজু ও ভাতুরিয়াবাজু মুঘল মীর-ই-বহর ইতিমাম খানকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল। সোনাবাজুর এক সময়ের প্রভাবশালী জমিদার মাসুম খান কাবুলীর পুত্র মিরযা মোমীন, খান আলম বাবুদীর পুত্র দরিয়া খান ও খালসির জমিদার মাধব রায় সম্মিলিত ভাবে ইতিমাম খানের প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে এই অঞ্চল সমূহের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করলে ইতিমাম খান এই সমস্ত- জমিদারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং শত্রু পক্ষ সোনারগাঁয়ের মুসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহন করেন। *বাহারিস্তানে* চাটমহল, চিলা, শাহপুর, নাজিরপুর, একদন্ড ইত্যাদি স্থানে মুঘল শিবির স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে চাটমহল, নাজিরপুর ও একদন্ড বর্তমান পাবনা জেলায় অবস্থিত। *বাহারিস্তান* হতে জানা যায় যে, মুঘল বাহিনী নাজিরপুর হতে অনেক হাতি

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করেন। [২৯] এভাবে দ্বাদশ মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে সমগ্র পাবনা অঞ্চল মুঘল কর্তৃত্বাধীনে এসে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুলতান ইলিয়াস শাহের সময় থেকে পাবনা অঞ্চলে সাঁতৈল ও ভাতুরিয়া নামে দুটি প্রতাপশালী জমিদারির অস্তিত্ব ছিল। ভাদুরিদের জায়গীর ছিল চলন বিলের উত্তরে এবং তাদের জায়গির ভাতুরিয়া নামে আখ্যায়িত হয়। বাংলায় মুঘল অভিজানের সময় পর্যন্ত সাঁতৈল ও ভাতুরিয়া জমিদারি টিকে ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা অভিযানের সময় ভাতুরিয়া জমিদার পাঠানদের পক্ষ নেয় আর সাঁতৈল জমিদার মুঘলদের পক্ষ নেয়। জয় লাভের পর মুঘলরা ভাতুরিয়াদের সাতটি পরগনার মধ্যে পাঁচটি পরগনা সাঁতৈল জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে পাবনা জেলার অধিকাংশ এলাকা সাঁতৈল জমিদারির অন্ত র্ভক্ত হয়ে যায়।[৩০] ইসলাম খান ১৬১০/১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভাটি অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বাংলা মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন, সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্ত রিত করা হয়। নতুন রাজধানীর নাম হয় জাহাঙ্গীর নগর। বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলাম খানের পর থেকে মুর্শিদকুলী খাঁনের সময় পর্যন্ত মোট ১৪ জন সুবাদার মুঘলদের পক্ষে বাংলা শাসন করেন। এই সময় কালে মুঘল শাসনাধীনে পাবনা অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায় না।

মুর্শিদকুলী খান ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ মুঘল সুবাদার। তিনি ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হলেও ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হিসাবে মৃত্যু বরণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁনের শাসনামলে বাংলায় তিনটি নতুন শক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এরা হলেন: (১) জমিদার শ্রেনী (২) অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (৩) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এই শক্তিগুলো প্রথমে ভুমি ও ব্যবসা বাণিজ্যে তৎপর হয় এবং পরে বাংলার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [৩১]

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেন। তাঁর প্রণীত রাজস্ব নীতির ফলে বেশ কিছু নতুন জমিদারির সৃষ্টি হয়, এই সকল নতুন জমিদারির মধ্যে একটি ছিল নাটোর জমিদারি। মুর্শিদকুলী খানের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দু কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি। তাঁর রাজস্ব সংগ্রহ কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন রঘুনন্দন, রঘুনন্দন টাকশালের দারোগাও ছিলেন এবং প্রশাসনে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁর প্রচেষ্টায় তার ভাই রামজীবন দেবীনগর, বনগাছি, ভাতুরিয়া, সুলতানপুর, স্বরূপপুর, ও ভূষণার জমিদারী লাভ করে নাটোর জমিদারীর জন্ম দেয়। পাবনা জেলা এই ভাবেই নাটোর জমিদারিভুক্ত হয়। নাটোর জমিদারি অষ্টাদশ শতকে বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদারিতে পরিণত হয়।

এদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ শতকের শেষ দিক হতেই তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। তারা সুবাদার আজিম উদ্দিনকে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম ক্রয়ের অধিকার লাভ করেন। তবে মুর্শিদকুলী খানের সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যক্রম নবাবের নিয়ন্ত্রনের মধ্যেই ছিল।

১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর সুবাদারের নিযুক্তি উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরবর্তী সুবাদারগণ সকলেই বাহুবলে ক্ষমতা দখল করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেন। এই কারণে অষ্টদশ শতকের বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমল নামে পরিচিত। [৩২]

১৭২৭ থেকে ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাবনা জেলা তৎকালীন বাংলায় নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৪০-১৭৫৬ পর্যন্ত নবাব আলীবর্দী খানের অধীনে শাসিত হয় এ সময় নাটোর জমিদারী প্রথমে রামজীবন ও পরে তাঁর স্ত্রী রাণী ভবানীর অধীনে পরিচালিত হত। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন তিনি এক বছর কাল শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েই নবাবকে অভিজাত বর্গের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে হয়। এই ষড়যন্ত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও অভিজাতদের সাথে যোগ দেন। অবশেষে ইংরেজদের সাথে বিরোধের সুত্র ধরে নবাব সিরাজউদ-দৌল্লা ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এতে করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের উপর প্রভূতঃ ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পায়। তারা চুক্তি মোতাবেক মীর জাফরকে বাংলার মুসনদে বসায়। কিন্তু মীর জাফর তার প্রতিশ্রুত অর্থ কোম্পানীকে দিতে না পারায় নবাবী হারান এবং মীর কাসিমকে বাংলার নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। মীর কাশিম ইংরেজদের নিয়ন্ত্রন হতে বাংলাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মীর কাশিমের গৃহিত ব্যবস্থা ইংরেজ স্বার্থে আঘাত হানায় বাংলার নবাবের সাথে পূণরায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংঘাত উপস্থিত হয়। ১৭৬৪ সালে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সহ নবাব মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়।

১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে নায়েব ও মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে নাজিম নিযুক্ত হন। এসময় আপাতদৃষ্টিতে দেশ নবাবী আমলের মত স্বাধীন মনে হলে ও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল মুঘল প্রশাসনের ছদ্মাবরণে ঔপনিবেশিক শাসন। এদিকে রেজা খানের দুর্বল শাসন ও কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও অত্যাচার নির্যাতনে ১৭৬৯-৭০ এ দেখা দেয় এক মহা দুভিক্ষ। ১৭৬৯ এর দুর্ভিক্ষ, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ধার্যকৃত অতিরিক্ত করের চাপ, ও খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী এক আন্দোলন দাঁনা বেধে উঠে, ইতিহাসে এটা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন রেনেলের বিবরণ থেকে পাবনা জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা সম্বন্ধে জানা যায়। এ সময় সিরাজগঞ্জের নিকট ফকিরদের দমনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য মুর্শিদাবাদ হতে লেফটেন্যাট টেলারের নেতৃত্বে দুটি সিপাহীদল প্রেরন করা হয়। মজনু শাহ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব কাল পর্যন্ত পাবনা ও তার আশেপাশের জেলা সমূহে তৎপর ছিলেন।[৩৩] দেশের এই অস্থিতিশীল অবস্থার জন্য দায়ী করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রেজা শাহকে বরখাস্ত করে এবং কোম্পানী সরাসরি নিজের হাতে দেওয়ানী পরিচালনার ভার নেয়, ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি প্রশাসনকে ইউরোপীয় করণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করেন। প্রতি জেলায় একজন কালেক্টর ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয। রাজস্ব বিভাগ পরিচালনার জন্য বোর্ড অব রেভিনিউ গঠন করা হয় যেখানে নিম্ন বেতনভোগী কতিপয় মুনশী মুহরার ছাড়া সকল পদেই শ্বেতাঙ্গদের নিয়োগ দেওয়া হয়। হেষ্টিংস বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতির পূণ:গঠনের জন্য পাঁচসালা ভূমি বন্দোবস্তের ফলে অনেক পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত হন। বহু অসৎ ও অর্থ লোভী দালাল সর্বচ্চো রাজস্ব প্রদানের শর্তে বন্দোবস্ত নেয় এবং অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে তারা আমানবিক অত্যাচার শুরু করেন। এভাবে হেষ্টিংসের পাঁচসালা বন্দোবস্ত দেশে অত্যাচার উৎপীড়ণের কারণ হয়ে দাড়ায়।

১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় ইউরোপীয় জেলা কালেক্টরকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জেলা কালেক্টর হলেন একাধারে জেলার রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন, এই রেগুলেশন অনুযায়ী যে কেউ কোন জমিদারির অংশ কিনে জমিদার হতে পারতেন।

ইংরেজদের ভূমি ব্যবস্থা, খাজনা বৃদ্ধি, দূর্ভিক্ষ, ইত্যাদি কারণে এই সময় নাটোর জমিদার রাণী ভবাণী কৃষকদের প্রভূত খাজনা মাফ করে দেন। এছাড়া দান ধ্যান ও পূণ্য কর্মে অধিক ব্যয়, জমিদারির আমলাদের দূনীতি, স্বার্থান্ধতা, চক্রান্ত প্রভৃতি কারণে নাটোর জমিদারির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ফলে জমিদারের আমলাগণ কৌশলে জমিদারির অংশ বিশেষ নিলামে কিনে নিয়ে নব্য জমিদার রূপে আত্ম প্রকাশ করে।[৩৪] বড় বড় জমিদারিগুলো ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারির

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয়। এভাবে নাটোর জমিদারি ভেঙে পাবনা অঞ্চলে তাড়াশ, দুলাই, তাঁতীবন্দ, শিতলাই, পার্শ্বভাঙ্গা, হরিপুর, সাদুল্লাহপুর, সলপ, স্থল পোরজন বেলুকচি ইত্যাদি সহ বহু জমিদারির সৃষ্টি হয়, এদের মধ্যে হিন্দু জমিদারের সংখ্যাই ছিল বেশী।

পাবনা জেলার এই সমস্ত জমিদারগণ সরকার নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার অবৈধ কর রায়তদের উপর ধার্য করেন। ফলে প্রজা সাধারণের দূর্ভোগ বাড়তে থাকে। কর আদায়ে জমিদার কর্মচারীদের অত্যাচার নিপীড়ন প্রজা ও জমিদারের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করে যা ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহে রূপ নেয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'কৃষক বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। পাবনা জেলার ইউসুফশাহী পরগনায় এই বিদ্রোহ প্রথম দেখা দিলে ও পরবর্তীতে সমগ্র পাবনা সহ এর আশেপাশের জেলাগুলোতে কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরে। বিদ্রোহের আকস্মিকতা ও ব্যাপকতায় পাবনার স্থানীয় প্রশাসন ফলপ্রসু ভাবে তা দমনে ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারন করলে পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু কৃষক নেতা ধৃত হয় এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৮৭৩ সালের এই কৃষক বিদ্রোহের ফল কেবল পাবনা জেলারই নয় সমগ্র বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারি হয়েছিল। এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা আইন তৈরী হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট' তৈরীর মাধ্যমে তা স্থায়ী আইনে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

১৯০৫ সালে লর্ড কাজন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ হলে পাবনা জেলা নতুন প্রদেশ পূর্ব বাঙলা ও আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এটা সহজ ভাবে না নেওয়ায় ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এরপর বেশ কয়েকটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে, ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। এখানে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাবনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বস্থ প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। দেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থায় ও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে এবং ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আইনের দ্বারা জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগলিক দূরত্ব ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য সর্বপরি পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বিছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়। পাবনা জেলা বর্তমানে এই স্বাধীন বাংলাদেশের একটি জেলা।

আয়তন ঃ

ইতিহাসের এই বিস্তীর্ণ পথ পরিক্রমায় পাবনা জেলার সীমা রেখা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। ১৮২৮ সালের পূর্বে পাবনা বলে কোন জেলার অস্তিত্ব ছিন না। অষ্টদশ শতকের শেষভাগে ফকির সন্নাসীদের আন্দোলন সহ বৃটিশ ও জমিদার শোষন বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই অঞ্চল বিশেষ করে চলন বিল এলাকায় ডাকাত দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাই আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার পাবনা নামে একটি আলাদা জেলা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। রাজশাহী থেকে খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, মাথুরা, ও পাবনা এই পাঁচটি থানা ও যশোর জেলা থেকে ধর্মপুর (পাংশা), কুষ্টিয়া ও মধুপুর থানা নিয়ে প্রথম পাবনা জেলা গঠন করা হয়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে সিরাজগঞ্জ থানাকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে কেটে পাবনা জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পাংশা, খোকশা ও বালিয়াকান্দি থানা সমূহ নিয়ে কুমারখালী নামে একটা মহকুমা গঠন করা হয়। ১৮৬২-৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়া মহকুমাকে পাবনা জেলা থেকে বিছিন্ন করে নদীয়া জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মাকে পাবনা জেলার দক্ষিণ সীমানা হিসাবে ধার্য করা হয়। ফলে পাংশাকে পাবনা জেলা হতে বিছিন্ন করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহাকুমা ও কুমারখালী থানা নদীয়া জেলাভুক্ত করা হয়। এভাবে দেখা যায় ১৭৭২ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত পাবনা জেলা ছিল রাজশাহী জেলার অন্ত র্ভুক্ত। তারপরের ৫০ বছর যাবৎ চলে পাবনার সীমা পরিবর্তন। সর্বশেষ সীমা পরিবর্তন হয়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই বছর প্রশাসনিক পূর্ণ বিন্যাসের ফলে পাবনা জেলাকে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ এই দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। বর্তমান পাবনা জেলা মোট ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিতঃ (১) চাটমোহর (২) ভাঙ্গুরা (৩) ঈশ্বরদী (৪) আটঘরিয়া (৫) পাবনা (৬) সুজানগর (৭) ফরিদপুর (৮) সাঁথিয়া (৯) বেড়া।

বর্তমানে পাবনা জেলার আয়তন ১৯০ বর্গ মাইল/ ৩০৪ বর্গ কিলোমিটার। এর পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬৭ মাইল/১০৭.২ কিলোমিটার ও উত্তর- দক্ষিণে ৩০ মাইল/৪৮ কিলোমিটার বিস্তৃত।

অবস্থান ঃ

পাবনা জেলা দক্ষিণ পূর্বাংশে ২৩° ৪৯´ ও ২৪° ৪৫´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৯° ১´ ও ৮৯° ৫৩´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলা পশ্চিমে রাজশাহী জেলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণে যথাক্রমে যমুনা ও পদ্মা নদী দ্বারা সীমানা নির্ধারিত।

পাবনা জেলার পূর্ব ও দক্ষিণের যমুনা ও পদ্মা নদী ছাড়াও এ জেলার অভ্যন্তরে ছোট বড় নদী ও খাল বিলের আধিক্য রয়েছে। যা এই জেলার বিভিন্ন অংশের স্থানীক গুরুত্বকে প্রভাবিত করেছে। পাবনা জেলার অভ্যন্তর দিয়ে প্রভাবিত নদী গুলোর মধ্যে বড়াল, ইছামতি, আত্রাই, চিকনাই ইত্যাদি নদীই প্রধান। এছাড়া চলন বিল ও গাজনার বিল পাবনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ নাব্য জলধারা গুলোর মধ্যে প্রধান বলে বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২, পৃ. ১১৫-১৬

২. *ঐ*, পৃ. ৩৫৫

৩. G. Bhattacharya, National Museum & Prasasti of Pahila, *Journal of Bengal Art* Vol. 2, 1997, p. 114

৪ . ডি.সি. সরকার, *পাল সেন যুগের বংশচরিত*, কলকাতা, সলুদ্যালোক, ১৯৮২, পৃ. ৪৫

৫. Bhattacharya, *op. cit.*, p.117

৬. রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪

৭. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, মুহ. মমতাজুর রহমান, ১৯৯৮,পৃ.৭১

৮. কাজী মো. মিছের, *বগুড়ার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, বগুড়া, পৃ. ৩৪-৩৫

৯. রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬

১০. N.G. Majumdar, *Inscriptions of Bangal*, Vol. III, Rajshahi, The Varendra Research Society, 1929, pp. 106-15

১১. রাধা রমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পাবনা, ১৩৩০ বাংলা, পৃ. ৬

১২. Parmeshwari Lal Gupta, *Coins and History of Medieval India*, Compiled & edited by Sanjay Garg, Delhi, Rahul Publishing Honse, 1997, p. 17

১৩. মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, অনুবাদক, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৯

১৪. সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৮

১৫. *Epigraphia Indica, Arabic and Persian Supplement*, New Delhi, ASI, 1975, pp. 7-8

১৬. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৪

১৭. সুখময় মুখপাধ্যায় লিখেছেন "অনেকের বিশ্বাস গণেশ 'ভুদুড়ী' পদবীধারী বারেন্দ্র শ্রেনীর ব্রাহ্মন ছিলেন। আজ পর্যন্ত এই মতের স্বপক্ষে কোন প্রমান পাওয়া যায়নি (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃ. ১০৫) তবে

Dhaka University Institutional Repository

রাজা গণেশের সঙ্গে ভাতুরিয়া পরগণার সম্পর্কের কথা তিনি স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করেছেন। (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃ. ১০২-১০৫)

১৮. রেনেলের মানচিত্রে একে Pettorial উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯. *Bengal District Gazetteer*, Rajshahi, 1916, p. 29-30

২০. মুখপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৫

২১. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p.127

২২. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ: ৪২৩

২৩. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৪. করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩

২৫. করিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬

২৬. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, রাজশাহী, আই.বি.এস., ১৯৯২, পৃ. ৪৯

২৭. Shamsud-Din-Ahmed, *Inscription of Bengal*, Vol. IV, Rajshahi, The Varendra Research Museum, 1960, p. 260

২৮. করিম, *প্রাগুক্ত*, ১৯৯২, পৃ. ১৫৯

২৯. মির্জা নাথান, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৬-১৮।

৩০. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও আন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯২।

৩১. ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৭৬

৩২. *ঐ*, পৃ. ৬৫

৩৩. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারস, পাবনা*, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৪১

৩৪. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও আন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থাপত্য নিদর্শন: মুঘল আমল

১৫২৬ সালে জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম মুঘল সম্রাট বাবুর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শাসনামলে মুঘলদের বাংলা জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সম্রাট বাবুরের রাজত্বকালে সুলতান নসরত শাহ্ বাংলা শাসন করতেন। মুঘল আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাংলার শাসনকর্তা নসরত শাহ্, জৌনপুরের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদী ও বিহারের আফগান নেতা শের খান একটি শক্তিশালী জোট গঠন করেন। ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে ঘঘরার যুদ্ধে শক্তিজোট শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরন করে এবং নসরত শাহ্ মৌখিক ভাবে মুঘল সম্রাট বাবুরের বশ্যতা স্বীকার করেন। যদিও বাবুর বাংলার স্বাধীনতায় তেমন কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই কিন্তু এটিই ছিল মুঘলদের নিকট বাংলার সুলতানের প্রথম পরাজয়। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে শের শাহ্ নামের বিহারের একজন আফগান সর্দার প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলা দখল করলে সম্রাট হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করেন। এর রেশ ধরে ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে সংঘটিত চৌসার যুদ্ধ ও ১৫৪০ সালের কনৌজের যুদ্ধে সম্রাট পরাজিত হলে কিছু সময়ের জন্য ভারতে মুঘল শাসনে ছেদ পরে। ১৫৩৬ থেকে ১৫৫৫ পর্যন্ত উত্তর ভারত সহ বাংলা শের শাহ্ ও তার বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন পূণরায় দিল্লী অধিকার করলে শূর বংশের পতন ঘটে। তবে ১৫৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলায় শূর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৫৬৪ সালে কররানী বংশীয় আফগান তাজখান কররানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে কররানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৭৬ সালে কররানী বংশের শেষ সুলতান দাউদ খান কররানী মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খানের নিকট পরাজিত হলে বাংলায় প্রথম কার্যকরী অর্থে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে মুঘলদের আরও তিনদশক সময় লাগে কেননা তখন পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব বাংলা আফগান নেতা ও বার ভূইঞাদের অধিনে রয়ে যায়। এর মধ্যে মুঘল বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠে। সম্রাট আকবরের শাসনামলে এই অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সেনাপতি ইসলাম খানের নেতৃত্বে (১৬১০ খ্রি.) বাংলায় মুঘল শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এরপর থেকে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসাবে শাসিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের সময় পর্যন্ত তা মুঘল সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় এবং সেই সূত্রে বাংলাও স্বাধীন হয়ে পরে। বাংলার নবাবগণ কার্যতঃ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করলেও তাঁরা মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা বৃটিশ নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। তবে ১৮৫৭ সালের আগ পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক ভাবে হলেও বাংলায় মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করা হত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে বৃটিশ সরকার নিজ হাতে নিয়ে নেন এবং ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

বাংলায় মুঘলদের আগমনে এক দিকে যেমন গড়ে উঠে নতুন নতুন শহর অপর দিকে মুঘল চিন্তা চেতনা বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। মুঘল পূর্ব বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের একটি বিশেষ রূপ গড়ে উঠেছিল যা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের স্থাপত্য রীতি হতে ছিল ভিন্ন। পুরু দেয়াল ও বক্র কর্ণিশের এই ইমারত গুলো পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত করা হত। ধর্মীয় স্থাপত্যে বহু গম্বুজের ব্যবহার, বহু প্রবেশদ্বার, দ্বিকেন্দ্রীক নীচু খিলান, ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত চার কোনের পার্শ্ব বুরুজ, শীর্ষদন্ড ও স্কন্ধ বিহীন নীচু গম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপরি নির্মাণ উপাদান হিসাবে ইটের সার্বজনীন ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যকে স্বতন্ত্রতা দান করেছিল।

অপর দিকে মুঘলগণ বাংলায় এসে একটি নব রীতির সূচনা করে। মসজিদ স্থাপত্যে এক আইল পরিকল্পনা, ছাদ থেকে আরো উপরে বিস্তৃত পার্শ্ববুরুজ, প্যারাপেট যুক্ত সোজা কর্ণিশ, শীর্ষদন্ড যুক্ত উচু গম্বুজ সর্বপরি সমগ্র দেয়াল গাত্রে পলেস্তরার প্রলেপ যুক্ত অলংকরণে প্যানেল নকশার ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। মুঘল শাসনের প্রথম দিকে বড় বড় শহর যেমন- রাজমহল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে স্থাপত্য ক্ষেত্রে মুঘল রীতির প্রচন্ড প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থাপত্যে মুঘল পূর্ব রীতির প্রভাব মুঘল শাসনামলেও অনুভূত হয়। পাবনা জেলায় মুঘলামলের খুব বেশী স্থাপত্য অবশিষ্ট নাই। তবে যে দু চারটি মুঘল মসজিদ এখনও টিকে আছে তা মুঘল শাসনামলে মসজিদ স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর ভারতের ন্যায় বাংলায় পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় পূর্বের ন্যায় ইটই স্থাপত্য নির্মাণের প্রধান উপাদান হিসাবে রয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ক.মসজিদ স্থাপত্য

চাটমোহর শাহী মসজিদ

চিত্র: ১, ২ ভূমি নকশা: ১

অবস্থান:

চাটমোহর শাহী মসজিদটি চাটমোহর উপজেলার কাজিপাড়ায় অবস্থিত।[২] মসজিদটি চাটমোহর রেলষ্টেশন হতে প্রায় ২.৪০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে এবং চাটমোহর বাজার হতে .৭৫ কি.মি. পূর্বে বড়াল নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। স্থানীয় ভাবে এটি শাহী মসজিদ নামে পরিচিত।

বর্ণনা:

অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রায় দুই বিঘা জমির পশ্চিম প্রান্তে নির্মিত চাটমোহর মসজিদটি এক আইলে নির্মিত একটি আয়তকার ইমারত। এর বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য ১৮.২৮ মিটার এবং প্রস্থ ৮.২২ মিটার। দেওয়াল ১.৮২ মিটার প্রশস্ত। গম্বুজ ছাড়া মসজিদের উচ্চতা ৮.২২ মিটার এবং গম্বুজ সহ ১৩.৭১ মিটার। মসজিদের চার কোনে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। পার্শ্ববুরুজগুলো ১৯৯১ সালে পূণঃনির্মিত।[৩] মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আরও দুটি প্রবেশ পথ ছিল যা বর্তমানে জালি দ্বারা বন্ধ। সবগুলো প্রবেশপথই দ্বিকেন্দ্রীক কৌনিক খিলানাকারে নির্মিত যা বাংলার সুলতানি স্থাপত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী গুলো আপেক্ষা উচু। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে। মিহরাবগুলোও আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। এর কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আকার ও অলংকরণে পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা জাঁকালো। মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়ালে খিলানসমূহে পাথরের সংলগ্ন স্তম্ভ লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পার্শ্বে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বার রয়েছে। মসজিদের গম্বুজ তিনটি। এরা সমআকৃতির এবং নীচু করে গড়া। গম্বুজ নির্মাণে কোন স্কন্ধের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। সুলতানী রীতিতে মসজিদটির গম্বুজগুলো সরাসরি ছাদ হতে উত্থিত। মসজিদের অভ্যন্ত র ভাগের দৈর্ঘ্য ১৪.১৭ মিটার এবং প্রস্থ ৪.২৬ মিটার। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ আড়াআড়িভাবে নির্মিত দুটি খিলান দ্বারা তিনটি বর্গে বিভক্ত। প্রতিটি বর্গের উপর নির্মিত হয়েছে একটি করে গম্বুজ। গম্বুজ নির্মাণে ব্যবহৃত পান্‌দানতিভগুলো বহির্ভাগে কৌনিকাকারে উদগত ইট দ্বারা ক্রমহ্রাসমান সারিতে নির্মিত। প্রফেসর এ. বি. এম.হোসেন এই ধারায় নির্মিত পান্‌দানতিভকে বেঙ্গলী পান্‌দানতিভ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

অলংকরণ:

মসজিদের বহিঃদেওয়াল খুব বেশী অলংকৃত নয়। সংস্কারের পর এর সামনের দেয়ালের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে একটি অনুভূমিক ব্যান্ড সমগ্র মসজিদটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। উপর ও নীচে সমগ্র ফাসাদ অনেকগুলো আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত। মসজিদ ফাসাদকে অনুভূমিক রেখা দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত করা একটি সুলতানী বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ শতকের প্রথমাধ্যয়ে নির্মিত পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি, ১৪৮০ সালে নির্মিত গৌড়ের তাঁতীপাড়া মসজিদ ও ১৫৩১ সালে নির্মিত কদম রসুল এ ধরনের দ্বিধাবিভক্ত ফাসাদ অলংকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অপর দিকে মসজিদের বহিঃদেয়ালকে বিভিন্ন প্যানেলে বিভক্ত করার বৈশিষ্ট্যটি মুঘল নির্মাণ রীতির অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।[৫] মসজিদের প্রবেশ খিলানের ওপরে (স্প্যানড্রিলে) চক্রাকার ফুলের নকশা (রোজেট) দেখা যায়। মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে বিশেষ করে এর কেন্দ্রীয় খিলানে আদি অলংকররে চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান। এর শিরভাগে বদ্ধ মারলন নকশা ছাড়াও সমগ্র খিলান লতা-পাতা, চক্রাকার নকশা ও পাড় নকশা দ্বারা অলংকৃত। মিহরাব দেয়ালে বিদ্যমান টেরাকোটা ও ইটের উপর খোদাই নকশার যে নমুনা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই সুলতানী বাংলার স্থাপত্য রীতি দ্বারা প্রভাবিত। বগুড়ার শেরপুরের

Dhaka University Institutional Repository

খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.) ও সমসাময়িক গৌড়ের ইমারত সমূহের টেরাকোটা নকশার কম-বেশী সামঞ্জস্য এখানে খুজে পাওয়া যায়।

নির্মাণকাল:

এই মসজিদ হতে মোট দুইটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এর একটি মসজিদ অঙ্গনের কূপের মধ্যে প্রথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর অপরটি মসজিদের প্রবেশদ্বারের ওপর প্রথিত ছিল। বর্তমানে প্রথমক্ত শিলালিপিটিই প্রবেশ দ্বারের ওপর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় লিপিটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৬]

কালো পাথরে খোদিত প্রথম লিপিটিতে তুঘরা রীতিতে কালেমা উৎকীর্ণ রয়েছে। শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

لا اله الا الله محمد رسول الله حقت

দ্বিতীয় লিপিটি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম খুজে পান এবং পরবর্তীতে হেনরি বল্কম্যান এর পাঠোদ্ধার করেন।[৭] লিপিটি কালো পাথরে দুই স্তরে উৎকীর্ণ। এর পাঠ নিম্নরূপ:[৮]

١. این مسجد رفیع در زمان سلطان الاعظم عمدة السادات ابو الفتح محمد معصوم خان خلد الله ملکه (ابدا یارب و یا باقی)-

٢. بنا کرد خان رفیع مکان عالیشان خان محمد بن توی محمد خان قاقشال فی سنة تسع و ثمانین و تسعمایة-

অনুবাদঃ

"1. This lofty mosque (was built) during the time of great Sultan, the chief of the Sayyids, Abdul Fath Mahammad Ma'sum Khan ; may Allah perpetuate his kingdom forever, O Lord , O thou who is Ever lasting;

Dhaka University Institutional Repository

2. (It) was built the high exalted Khan Khan Mahammad son of Tuwi Khan Qaqshal; in the year nine hundred and eighty nine: 989/1581)" [৯]

মাসুম খান ছিলেন আকবরের ভাই মির্জা হাকিমের পালক মাতার পুত্র।[১০] তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে একজন সেনানায়ক ছিলেন।[১১] ২০ বছর বয়সে তিনি সম্রাট কর্তৃক পাঁচশত সৈন্যের সেনাধক্ষ্য নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আপন দক্ষতার পুরস্কার হিসাবে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কে উন্নিত হন। ১৫৮০ খ্রি. সম্রাট আকবর প্রবর্তিত দীন-ই-এলাহী ধর্ম ও একই সময়ে যুদ্ধরত সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহীরা কাবুলের শাসনকর্তা আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিমকে সম্রাট নির্বাচিত করেন এবং তাঁর নামে খুতবা পাঠ করেন। বিভিন্ন উপাধি, নিযুক্তি ও জায়গীর ইত্যাদি এমন ভাবে তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয় যাতে প্রত্যেক সেনা নায়ক কিছু কিছু ভাগ পায়। এ প্রকৃয়ায় মাসুম খান সম্ভবতঃ পাবনার চাটমোহর অঞ্চলে জায়গীর লাভ করেছিলেন। পরে তিনি কেন্দ্রের প্রতি অনুগত না থেকে উক্ত এলাকায় কিছু সময়ের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন।[১২] তিনি বার ভূইয়ার নেতা মসনদে আলা ঈসা খানের সাথে যোগ দিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে আমরন যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে বিদ্রোহী রূপেই ১০০৭ হিজরী/ ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

চাটমোহর শাহী মসজিদটি ১৯৫৪ সালে সংরক্ষিত ইমারত হিসাবে ইস্টার্ণ পাকিস্তান সার্কেল এর অধীনে তালিকা ভুক্ত হয়। মসজিদটি ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে সংস্কার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বালুচর গম্বুজ ঘর বা প্রহরা চৌকি

চিত্রঃ ৩

অবস্থানঃ

বালুচর গম্বুজ ঘর পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার বালুচর গ্রামে অবস্থিত। চাটমোহর উপজেলা সদর হতে এর দূরত্ব .৪০ কি.মি. (উত্তর)। এটা বড়াল নদীর দক্ষিন- পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

বর্ণনাঃ

এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বর্গকৃতির ইমারত। এর বাইরের দিকের আয়তন ১.৮০ /১.৮০ মিটার এবং ভেতরের দিকে ১.৩০/১.৩০ মিটার। গম্বুজ ঘরটির একটি মাত্র প্রবেশপথ এর পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রবেশপথটি পর্যায়ক্রমে দুটি ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর এর পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব আছে। পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের উপস্থিতির কারনে স্থানীয় ভাবে ইমারতটি মসজিদ হিসাবেও পরিচিত। তবে এর আকৃতি ও অবস্থান দৃষ্টে ইমারতটিকে প্রহরা চৌকি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।[১৩] পাতলা ইটের তৈরী এই ইমারতটি পূর্বে সম্পূর্ণ ভাবে পলেস্তরা আচ্ছাদিত থাকলেও বর্তমানে এর বাইরের দেয়ালের সমস্ত পলেস্তরা খসেপরেছে, তবে এর ভেতরের আস্তরন আপেক্ষাকৃত ভাল।

বালুচর গম্বুজঘরে একটি মাত্র গম্বুজ চতুর্কেন্দ্রীকাকারে নির্মিত। গম্বুজটি একটি উচু অষ্টকোনাকার ড্রামের উপর স্থাপন করা হয়েছে যাতে এই সময় উত্তর-ভারতে বিকশিত মুঘল স্থাপত্য রীতিটি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

অলংকরণঃ

বালুচর গম্বুজ ঘরের বাইরের দিকের পলেস্তরা খসে পড়ার কারনে এর আদি অলংকরণ তেমন কিছু অবশিষ্ট নাই। তবে এর গম্বুজের গোড়ায় ড্রামের চারিদিকে একসারি মারলন এখনও দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

ইমারতটির নির্মাণ রীতিতে মুঘল ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বড়াল নদীর তীরবর্তী চাটমোহর মুঘল বিদ্রোহী নেতা মাসুম খান কাবুলীর শাসনের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় সম্ভবতঃ তাঁর সময়ই এই সব প্রহরা চৌকি নির্মিত হয়েছিল (১৫৮০-১৫৯৯ খ্রি.)। তবে রীতি বৈশিষ্ট্যের দিক হতে এটা চাটমোহর শাহী মসজিদের (১৫৮১ খ্রি.) পরবর্তী কালের নির্মাণ বলে মনে হয়।

শিলালিপি:

এই ইমারতে কোন শিলালিপি নাই।

বালুচর গম্বুজঘর ছাড়াও চাটমোহর থানায় আরও তিনটি অনুরূপ প্রহরা চৌকি দেখা যায়। এদের দুটি বালুচর গ্রামে ও একটি পাঠান পাড়ায় অবস্থিত। পাঠান পাড়ার গম্বুজ ঘরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এই প্রহরা চৌকি গুলো একই আয়তনে নির্মিত।

মুঘল শাসনের প্রথম দিকে পাবনা ছিল উত্তরবঙ্গে মুঘল শাসনের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত এলাকা। বিভিন্ন শাখা নদী ও খাল- বিল বেষ্টিত চাটমোহরকে কেন্দ্র করে এই সময় মাসুম খান কাবুলী মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। সম্ভবতঃ তিনিই বহিঃশত্রুর আক্রমন হতে নিজ শাসনের কেন্দ্রস্থলকে সুরক্ষিত করতে এবং বহিঃশত্রুর গতিবিধির উপর নজরদারি করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী প্রাচীর ও নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রহরা চৌকি নির্মাণ করেছিলেন। প্রহরা চৌকিগুলো সহ এর প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও দৃশ্যমান রয়েছে। ডঃ আয়শা বেগম এই ধরনের ব্যবস্থাপনাকে সীমান্ত চৌকি (border outpost) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে মুঘল শাসনামলে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে এই ধরনের আরোও প্রতিরক্ষা চৌকির উপস্থিতির সম্ভবনা রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে চাটমোহরের সীমান্ত চৌকিগুলো তাদের একটি।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাইকপাড়া মসজিদ

চিত্রঃ ৪

অবস্থান :

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়ালের পাইকপাড়ায় একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এটি হান্ডিয়াল বাজারের পশ্চিম সীমান্তে বিলের ধার ঘেসে নির্মিত।

বর্ণনা :

পাইকপাড়া মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তকার ইমারত। উত্তর-দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য ৩৬ ফুট/১০.৯৭ মিটার। মসজিদের চার ধারে চারটি গোলাকার সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভগুলো ছাড়াও আরও চারটি সরু স্তম্ভ এর বহিঃ দেয়ালে মিহরাবের দুই পাশে ও কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের দুই পাশে স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদের প্রবেশ পথ তিনটি। এগুলো তিন স্তরে অর্ধগোলাকৃতির খিলান সমন্বয়ে গঠিত। মূল মসজিদের সম্মুখে নির্মিত হয়েছে একটি আচ্ছাদিত বারান্দা। বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি বৃহৎ সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভদুটি অষ্টকোনাকৃতির এর উপরে অষ্টকোনাকার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে আট স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি ছত্রী। এছাড়া মূল মসজিদের স্তম্ভগুলো বরাবর ছাদের উপর নির্মিত হয়েছে আটটি ক্ষুদ্র বুরুজ। মসজিদটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নির্মিত। পূর্বে এখানে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ছিল এবং এর ভিতরে প্রস্তর স্তম্ভ ছিল বলে জানা যায়। মসজিদের নির্মাণ উপাদান ইট।

অলংকরণ :

মসজিদ অলংকরণে পলেস্তরা নকশাই সর্বত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর বহিঃদেয়ালে কর্ণিশের নীচে একসারি ব্রাকেট ও ফুল-পাতার লতানো নকশা রয়েছে। এ ছাড়া মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে বদ্ধ খিলান পটগুলোতে পলেস্তরার লতা ও ফুলের স্থুল নকশা দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কাল :

বর্তমানে মসজিদটির নির্মাণরীতি ও অলংকরণের ধারা হতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে মসজিদটি উনবিংশ শতকের আগে নির্মিত হয়নি। তবে সুলতানী আমল হতেই হান্ডিয়লে সমৃদ্ধশালী মুসলিম অধিবাস গড়ে উঠেছিল। এখানকার কাজিপাড়া, খাঁপাড়া, শেখপাড়া, মিঞাপাড়া, পাইকপাড়া ইত্যাদি নাম থেকে এখানকার মুসলিম অধিবাসের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সুলতানী আমলের পরে আফগান ও মুঘল আমলেও এখানে সেনাছাউনী স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৫] এখানে এক গম্বুজ সম্বলিত যে মসজিদ ছিল, জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট আকবর সেই মসজিদের নামে ১৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।[১৬] এই কথায় সত্যতা থাকলে মসজিদটি অন্তত পক্ষে মুঘল আমলের প্রথম অথবা মুঘল পূর্ব যুগে নির্মিত হয়েছিল বলা যায়। এছাড়া এই মসজিদের একটি শিলালিপি প্রাপ্তির কথা জানা যায়। লিপিটি তুঘরা রীতিতে উৎকীর্ণ। তুঘরা লিপিশৈলী মূলতঃ সুলতানী ও পাঠান আমলের একটি জনপ্রিয় রীতি। মুঘল আমলে নাস্তালিক, সুলস ও নাসখ রীতির লেখনী অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মসজিদ স্থাপত্যে পাথরের স্তম্ভের ব্যবহার একে প্রাক মুঘল স্থাপত্য হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

শিলালিপি :

মসজিদটির গায়ে তুঘরা রীতিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি ছিল যা পাবনা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব মাহমুদ কতৃক সংগৃহিত হয়েছিল বলে জানা যায়। [১৭] কিন্তু বর্তমানে লিপিটির কোন হদীস পাওয়া যায় না।

বুড়া পীরের মাযার

চিত্র: ৫

পাইক পাড়া মসজিদের সামনে দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি কবর রয়েছে। স্থানীয় ভাবে এটি মখলেসুর রহমান খোরাসানী ওরফে বুড়াপীরের মাযার বলে পরিচিত।এটি চার দিকে চারটি স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট একটি বেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে বাধানো কবর। সম্প্রতি কবরটিকে কেন্দ্র করে একটি কক্ষ নির্মাণের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসের ২৯ তারিখে এখানে ওরস হয় বলে জানা যায়।

ভাড়ারা শাহী মসজিদ

চিত্র: ৬, ৭, ৮ ভূমি নকশা: ২

অবস্থান :

পাবনা শহর হতে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে পদ্মার উত্তর তীরে ভাড়ারা গ্রামে (ইউনিয়ন: ভাড়ারা, থানা: পাবনা সদর) ভাড়ারা শাহী মসজিদটি অবস্থিত।

বর্ণনা :

ভাড়ারা শাহী মসজিদটি চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি ইমারত। মূল মসজিদের সামনে রয়েছে একটি অঙ্গন। অঙ্গন হতে মূল মসজিদে প্রবেশের জন্য মসজিদের সামনে একটি দোচালা প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এর দোচালা ছাউনির নীচে প্রবেশদ্বারটি দুটি খিলান সহযোগে গঠিত। এর প্রথমটি চর্তুকেন্দ্রীক ও অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে তৈরী এবং দ্বিতীয়টি অর্ধগোলাকৃতির ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত। দোচালা এ প্রবেশ পথ ছাড়া মসজিদ প্রাঙ্গনে রয়েছে একটি বর্গাকৃতির মিনার। মিনারটি একতলা বিশিষ্ট ও মূল মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। একটি সোপান শ্রেনীর সাহায্যে মিনারের উপরে উঠার ব্যবস্থা রয়েছে।

মূল মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার ও প্রস্থ ৬ মিটার। পরবর্তী কালে মূল মসজিদটির সাথে একটি বারান্দা সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে এর আয়তন ১৫ মিটার/১২.৫মিটার, উচ্চতা ৭.৫ মিটার। মসজিদের চারকোনে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। অষ্টকোনাকারে নির্মিত এই বুরুজেগুলো ক্রমশঃ সরু হয়ে ফুটন্ত ফুলের ন্যায় মসজিদের কর্ণিশ বরাবর এসে শেষ হয়েছে। এর উপরে ছত্রী আকারে নির্মিত মসজিদের পার্শ্ব বুরুজের উর্ধ্বাংশগুলো প্রায় ১.৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। পার্শ্ব

Dhaka University Institutional Repository

বুরুজ ও মিনারগুলো ফুটন্ত ফুলের ন্যায় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়েছে। এই ধরনের পার্শ্ববুরুজ অষ্টদশ শতকের শেষার্ধে ও উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মুর্শিদাবাদের চক সেরাই মসজিদে দেখা যায়।[১৮] মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বাইরের দিকে কিছুটা উদ্‌গত ভাবে নির্মিত। এই উদ্‌গত অংশের দুই পার্শ্বে আরো দুটি সরু সংলগ্ন-স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই স্তম্ভ দুটিও ছাদ হতে ১.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মিনার আকারে শেষ হয়েছে। এর কর্ণিশের উপরে অনুচ্চ বেষ্টনী প্রাচীরও লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদটি এক আইলের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী মুঘল রীতিতে তৈরী। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালেও একটি করে প্রবেশ পথ তৈরী করা হয়েছে। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথগুলো বহুখাজ বিশিষ্ট ও অর্ধগম্বুজের মধ্যে দ্বিকেন্দ্রীকাকারে নির্মিত। মুঘল স্থাপত্যে প্রবেশপথে অর্ধগম্বুজের ব্যবহার একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি। বাংলার স্থাপত্যে এই ধরনের অর্ধগম্বুজের ব্যবহার সপ্তদশ শতকের চতুর্থ দশকের পূর্বে দেখা যায় না। মসজিদের পূর্ব দেয়ালটি বিভিন্ন বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত। এর প্রবেশপথগুলোর উভয়পার্শ্বে দুটি করে মোট ছয়টি কুলঙ্গি রয়েছে।

পূর্ব দিকের প্রবেশপথের সংখ্যা অনুযায়ী মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যাও তিনটি। মিহরাবগুলো একই উচ্চতা সম্পন্ন হলেও কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অধিক জাঁকালো ভাবে অলংকৃত। মসজিদে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বারও রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মসজিদটির অভ্যন্তরভাগ সম্প্রতি সম্পূর্ণ সংস্কার করায় এর আদি নিদর্শন এখন আর খুজে পাওয়া যায় না। মসজিদের ভেতরের অংশ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত দুটি বৃহৎ খিলান দ্বারা তিনটি সমান বে' তে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বে' র উপর পানদানতিভের সমর্থনে নির্মিত হয়েছে মসজিদের তিনটি গম্বুজ।

অলংকরণ :

ভাড়ারা মসজিদের বহিঃদেয়ালের অলংকরণ খুবই সীমিত। এর পশ্চিম দেয়ালের প্যারাপেটে বদ্ধ মারলন নকশা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ফিতা নকশা রয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে সম্প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

কালে একটি দ্বিতল বারান্দা সংযুক্ত করায় এর পূর্ব প্যারাপেটটি আর দৃষ্টিগোচর হয়না। গম্বুজের শীর্ষদন্ডগুলো আধাফোটা পদ্মকলি আকারে নির্মিত।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগের অলংকরণের ক্ষেত্রে এর স্থাপত্যিক রেখাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত অভ্যন্তরিন খিলান দুটি বহু খাজ নকশায় অলংকৃত। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবেই শুধুমাত্র অলংকরণের বাহুল্য দেখা যায়। মিহরাব খিলানটি এর প্রান্তিক রেখা ধরে এক সারি ছোট ছোট অবতল নকশায় অলংকৃত। এই ধরনের অবতল নকশা মূলতঃ অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলার স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়।

নির্মাণকাল:

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপর সংস্থাপিত শিলালিপি হতে এই মসজিদের নির্মাণকাল ১১৭৬ হিজরী বা ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানা যায়।

শিলালিপি:

ভাড়ারা মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিটি কালো পাথরের উপর উৎকীর্ণ ছিল। বর্তমানে শিলালিপিটি সাদা রং করে তার উপর লাল রং দিয়ে লেখাগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাস্তালিক রীতিতে লিখিত এই লিপিটি তিন লাইন বিশিষ্ট। এর প্রথম লাইনে তৎকালীন সম্রাট জাহান্দার শাহ্ আলমের নাম, দ্বিতীয় লাইনে নির্মাতার নাম, তৃতীয় লাইনে নির্মাণ তারিখ ক্রোনগ্রামে উৎকীর্ণ আছে। এর চতুর্থ লাইনে নির্মাণ তারিখটি সংখ্যায় উৎকীর্ণ রয়েছে।

লিপির পাঠ নিম্নরূপঃ

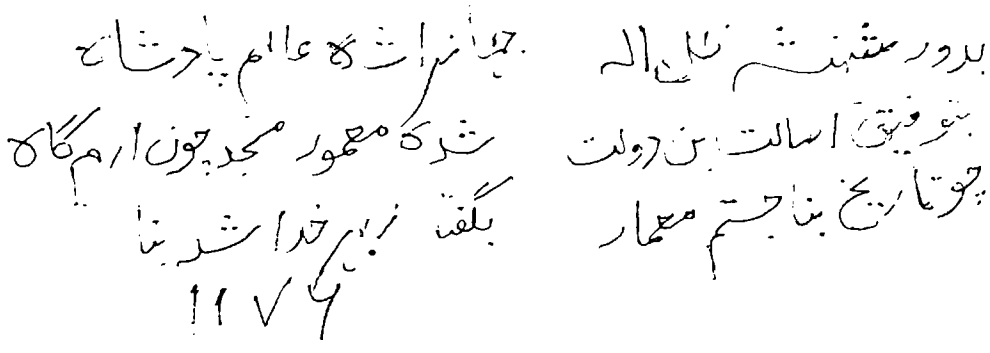

Dhaka University Institutional Repository

অর্থঃ

পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া বলে পরিচিত সম্রাট শাহ আলমের শাসনামলে

জনৈক আসালাত বিন দৌলত, বেহেস্তের সাথে তুলনীয় মসজিদটি নির্মাণ করেন

এ মসজিদের নির্মাণ তারিখ অনুসন্ধাণে জানা যায় যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ১১৭৬ হিজরীতে নির্মাতা এটি নির্মাণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ.মন্দির স্থাপত্য:

জোড় বাংলা মন্দির

চিত্র: ৯,১০ ভূমি নকশা: ৩

অবস্থান:

পাবনা শহরের উত্তর-পূর্ব কোনে রাঘবপুরের কালাচাঁদ পাড়ায় পাবনা জোড় বাংলা মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা:

ইটের তৈরী এই মন্দিরটি খড়ের দোচালার মত করে নির্মিত। একই আয়তনের দুটি দোচালা বাংলাঘরের ন্যায় লাগোয়া ভাবে নির্মিত হওয়ায় এই মন্দিরটি জোড় বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটি আকারে বেশী বড় নয়। এর অনুচ্চ বেদীর আয়তন ৯.৭৫/৯.৪০ মিটার। মূল মন্দিরটির আয়তন ৫.৫০/৬ মিটার। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। এই পশ্চিম দিকে একটি অপ্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। মন্দিরের ভিত্তি বেদীর উচ্চতা বর্তমানে .৬০ মিটার হলেও জানা যায় যে আদিতে এই ভিত্তি বেদী অনেক উচু ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এর ভীত অনেকাংশে মাটির নীচে দেবে গেছে।[১৯]

পাশাপাশি নির্মিত এই দোচালা দুটির প্রথমটি অলিন্দ ও দ্বিতীয়টি গর্ভগৃহ। প্রথম দোচালা হতে দ্বিতীয় কক্ষে ঢোকার জন্য মাঝখানে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। দ্বিতীয় কক্ষের উত্তর দিকেও একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ বহুভূজাকৃতির দুটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলান সহযোগে নির্মিত। মন্দিরের উপরিভাগ ও কর্ণিশ সুঢৌল বাঁক যুক্ত। প্রতিটি দোচালার চারকোনায় কিছুটা অন্তঃপ্রবিষ্ট ও ব্যান্ডযুক্ত চতুষ্কোনাকার চারটি করে দুটি সংলগ্ন বাংলা ঘরে মোট আটটি সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণঃ

পাবনা জোড় বাংলা মন্দিরের মূল আকর্ষণ হল এর পশ্চিম দেয়ালের আগাগোড়া পোড়ামাটির অলংকরণ। মন্দিরের বাঁকানো কর্ণিশ ও দোচালার প্রান্ত রেখা বরাবর কয়েকটি আড়াআড়ি রেখা দ্বারা সৃষ্ট পাড় নকশা দ্বারা এর চারিধার অলংকৃত। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালে এই পাড় নকশার নীচে দোচালার বাঁকের সাথে সংগতি রেখে একসারি আনুভূমিক খোপ নকশা রয়েছে। এই প্রান্ত বরাবর উল্লম্ব ভাবে দুইসারি খোপ নকশা আনুভূমিক নকশার সাথে মিলিত হয়ে মন্দির গাত্রে একটি ফ্রেমের সৃষ্টি করেছে। এই ফ্রেমের অভ্যন্তরে ও খিলানগুলোর উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির ফলকে সামাজিক ও পৌরানিক মহাকাব্যিক (রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি) বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারনা করা হয়েছে। মন্দিরের খিলান স্তম্ভ ও পশ্চিম দেয়ালের নিম্নাংশে পোড়ামাটির ফলকচিত্র দেখা যায়। এছাড়া নৃত্যরত পুরুষ ও রমণী, বাদকদল, শোভাযাত্রা, যুদ্ধরত ও ছুটন্ত অশ্বারহী, জ্যামিতিক নকশা ও লতানো নকশা মন্দির অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্দির অলংকরণে দুই ধরনের পোড়ামাটির ফলক চিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১। ছাচে নির্মিত ফলক

২। হাতে তৈরী ফলক।

সাধারণতঃ মন্দিরের খিলান ফ্রেম ও অন্যান্য স্থাপত্যিক রেখা ধরে যে পাড় বা আউট লাইন নকশা করা হয়েছে তাতে ছাচে নির্মিত ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ খিলান পাড়ের ফুল ও পাতার নকশা এবং সারিবদ্ধ হাঁসের প্রতিকৃতি। কিন্তু মন্দির গাত্রের অন্যান্য নকশা বিশেষ করে মহাকাব্যিক ও সামাজিক দৃশ্যের চিত্রায়নে ভেজা মাটিতে খোদাইকৃত পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হত। এই কারণে সমসাময়িক পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত মন্দির স্থাপত্য অলংকরণের বিষয়বস্তু কম-বেশী এক ধরণের হলেও উৎকীর্ণ ফলক কোনটির সাথে কোনটি হুবুহু মেলে না।

নির্মাণ কালঃ

পাবনা জোড় বাংলা মন্দিরে কোন লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৯২৮ সালে যখন এই ইমারতটি প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণের জন্য গৃহিত হয়েছিল তখনও এর কোন

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি ছিল কিনা তা জানা যায় না ।[২০] তবে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী ব্রজমোহন ক্রোড়ী নামক মুর্শিদাবাদের নবাবের এক তহশীলদার আঠার শতকের মধ্যভাগে এ মন্দির নির্মান করেন।[২১] *বাংলায় ভ্রমন* [২২] ও *পাবনা জেলার ইতিহাস* এ,[২৩] এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পাবনা জেলার ইতিহাসে উল্লেখ করা হযেছে যে, উনবিংশ শতকের শেষ দিকে জনৈক নাগবংশীয় কায়স্থ মন্দিরটি ক্রয় করেন। এছাড়া ছাতনী গ্রামের ভোলা নাথ সান্যালের নিকট হতে প্রাপ্ত ১০১৪ বঙ্গাব্দ/১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিলে ব্রজ বল্লভ দাসের নাম পাওয়া যায়। এই ব্রজ বল্লভ দাসকে জোড় বাংলার নির্মাতা ব্রজ বল্লভ ক্রোড়ীর সাথে অভিন্ন মনে করা হয়।[২৪] মনমোহন চক্রবর্তীর মতানুসারে সুলতান হুসাইন শাহর শাসনামলে প্রথম জোড় বাংলা মন্দির নির্মিত হয় পাবনা জেলায়।[২৫] তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের দিক দিয়ে এতে অষ্টদশ শতাব্দীর মন্দির বলেই মনে হয়।

বিগ্রহ :

বর্তমানে মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ নাই। জানা যায় যে মন্দিরের অভ্যন্তরের বিগ্রহটি (রাধা গবিন্দ বা গোপীনাথ) রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ছিল।[২৬] ১৯১০ সালে এ বিগ্রহ স্থানীয় কালীবাড়ীতে আশ্রয় লাভ করে এবং জোড়বাংলার স্বত্বাধিকারী কালীবাড়ীর পুজক কর্তৃকপুজিত হত।[২৭] তবে নাজিমুদ্দীন আহমেদের মতে, মন্দিরটি সম্পুর্ণ ভাবে নির্মিত হওয়ার পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. হেনরি বল্কম্যান বাংলায় মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন:

ক। বখতিয়ার খলজির বাংলা আগমন থেকে ১৩৩৮ পর্যন্ত (১২০৪- ১৩৩৮)

খ। স্বাধীন সুলতানদের সময়কাল (১৩৩৮- ১৫৩৮)

গ। শের শাহ্ ও তাঁর উত্তরসুরীদের শাসনামল (১৫৩৮- ১৫৭৫)

ঘ। মুঘল শাসনামল (১৫৭৬-১৭৪০)

ঙ। নবাবী আমল (আলীবর্দী খাঁর ক্ষমতা লাভ হতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা দখল পর্যন্ত)।

যেহেতু বাংলার নবাবগণ মৌখিক ভাবে হলেও মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতেন সেহেতু বর্তমান আলোচনায় মুঘল আমল বলতে ১৫৭৬ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

২. নির্মল সিংহ ও অন্যান্য (সম্পাঃ), *বাংলায় ভ্রমন*, তৃতীয় সংস্করন, কলকাতা, শৈব প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৭, পৃ. ৭১-৭২

৩. আয়শা বেগম, চাটমোহর শাহী মসজিদঃ বাংলা স্থাপত্যশিল্পে যুগসন্ধিলগ্নের নিদর্শন, *শিলাপকলা*, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ২৯

৪. এ.বি. এম. হোসেন, সুলতানী বাংলার স্থাপত্যশিল্প – একটি পর্যালোচনা, *ইতিহাস*, ১০ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৮৩ বাং, পৃ. ৩০

৫. Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p.30

৬. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩

৭. Shamsud-Din-Ahmed, *Inscription of Bengal, vol. IV*, Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960, p.259

৮. *Ibid*, p.260

৯. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p. 413

১০. H. Blockmann (ed.), *The Ain-i Akbari*, vol.I, New Delhi, 1989 (reprint) , p. 476, note.i

Dhaka University Institutional Repository

১১. Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal Period*, vol. I, Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1992, p. 62

১২. *Ibid*, pp. 62-63

১৩. George Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal*, Paris, UNESCO, 1984, pp.194-95

১৪. Ayesha Begum, Forts in Medieval Bengal an Architectural Study (unpublished Ph.D. Thesis), Rajshahi, Institute of Bangladesh Studies, 1992, pp. 291-92

১৫. *Ibid.*

১৬. এম. এ. হামিদ, *চলন বিলের ইতিকথা*, পাবনা, ১৯৬৭, পৃ. ২২০

১৭. আব্দুল মান্নান তালুকদার, প্রবাদ জনশ্রুতি কিংবদন্তির আবর্তে পাবনা জেলার পুরাকীর্তি, *অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০*, পাবনা ১৯৯১, পৃ. ৪০

১৮. হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

১৯. L.S.S.OMalley (ed.), *Bengal District Gazetteers (Pabna)*, Calcutta, 1923, p.119

২০. আয়শা বেগম, পাবনার জোড় বাংলা মন্দির, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ২

২১. *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh*, Dacca, Department of Archaeology and Museums, 1975, p.22

২২. নির্মল সিংহ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

২৩. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

২৪. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫; জাহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

২৫. মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ.২৪

২৬. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

২৭.সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

২৮. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh*, Dhaka, University Press Ltd., 1984, p. 102

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্থাপত্য নিদর্শন: উপনিবেশিক আমল

সম্রাট আওরাঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হতে বাংলায় মুঘল শাসন দূর্বল হয়ে পরে। নবাব মুর্শিদকুলি খান বাংলায় মুঘলদের অধিনস্ত একজন সুবাদার হলেও তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধর শাসক তার প্রমান পাওয়া যায় সুবা বাংলার রাজধানী 'মুর্শিদাবাদ' নামকরন হতে। মুশিদাবাদের পূর্বে যথাক্রমে রাজমহল ও ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানী ছিল এবং এদের নাম তৎকালীন সম্রাটদের নামানুসারে যথাক্রমে 'আকবর নগর ' ও 'জাহাঙ্গীর নগর' রাখা হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খানের সময় হতে বাংলার শাসকগণ নবাব বলে অভিহিত হতেন এবং দিল্লী সম্রাটের অধিনতা স্বীকার করলেও বাস্তবে তারা ছিলেন স্বাধীন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের নিকট নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা ঘটে। এরপরে যে কজন নবাব সিংহাসনে বসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই ইংরেজদের ক্রীড়ানক ছিলেন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ানী লাভের পর বাংলায় নবাবদের সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং তারা সামান্য বেতন ভোগী নবাবে পরিনত হন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মূলত: চলে যায় ইংরেজদের হাতে। নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় গৃহিত কিছু নীতির ফলে সমাজে এক নতুন অভিজাতশ্রেনীর সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৬৫ সাল ও এর পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক গৃহিত কতিপয় ব্যবস্থার কারনে ইংরেজ শাসনামলে এই ধরনের নব্য জমিদারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এই বিত্তশালী শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘলামলের শেষ দিক হতে বাংলায় প্রচুর মসজিদ, মন্দির, জমিদারবাড়ি নির্মিত হয়েছে। ১৭৭৫ সালে কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ার পর এখানে ইংরেজ শাসকশ্রেনী কর্তৃক যে সমস্ত প্রশাসনিক ভবন ও বাসস্থান নির্মিত হয় সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ইউরোপীয় কায়দায় নির্মিত। পরবর্তীতে বাংলার স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায় কলকাতার এই সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভবনগুলোর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মুঘল ও নিওক্লাসিকাল রীতির সংমিশ্রন লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে বৃটিশ স্থাপত্যের অন্ধ অনুকরণ এই সময় নির্মিত বাংলার স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্টে পরিণত হয়। বাংলার আবহাওয়ার সাথে সংগতি রেখে স্থাপত্য নির্মাণ করতে যেয়ে এই সকল ইমারতে বেশ কিছু স্থানীয় প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও সমগ্র উপনিবেশিক আমলে স্থাপত্য ক্ষেত্রে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ক.মসজিদ

বেরোয়ান মসজিদ

চিত্র: ১১, ১২ ভূমি নকশা: ৪

অবস্থান:

পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার অন্তর্গত চাঁদভা ইউনিয়নের বেরোয়ান গ্রামে (মৌজা: বেরোয়ান) একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। বেরোয়ান গ্রামে অবস্থিত বলে গ্রামের নামানুসারে মসজিদটি বেরোয়ান মসজিদ নামেই পরিচিত। মসজিদটি আটঘরিয়া উপজেলা সদর হতে ৩.২০ কি.মি.পশ্চিমে অবস্থিত। এর নিকটবর্তী নদীর নাম চন্দ্রাবতী। মসজিদটি নদী ও প্রধান সড়কের উত্তর দিকে অবস্থিত ।

বর্ণনা:

বেরোয়ান মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৪.৯০ মিটার ও প্রস্থ ৫.৬০ মিটার। অভ্যন্তর ভাগে এর পরিমাপ ১৩.৩০ / ৪.০০ মিটার। মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা তিনটি, চতুর্কেন্দ্রীক এই গম্বুজ গুলো নির্মাণে নীচু ড্রাম ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের চার কোণে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো মসজিদের কর্ণিশ ছাড়িয়ে তিনফুট উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। চারদিকের চারটি ছাড়াও এর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে সমান দূরুত্বে আরো দুটি করে মোট চারটি সংলগ্ন বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছে। বেরোয়ান মসজিদের পার্শ্ববুরুজের সঙ্গে গৌড়ের (বর্তমান নবাবগঞ্জ) শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর সমাধির পার্শ্ববুরুজের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে এর প্রবেশপথ তিনটি। এছাড়া এর দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালেও একটি করে প্রবেশপথ ছিল। বর্তমানে এ দুটো প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথ নির্মাণে অর্ধগোলাকৃতির খিলান দুই স্তরে নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানগুলো

Dhaka University Institutional Repository

গোলাকার স্তম্ভের উপর স্থাপিত। বাংলার স্থাপত্যে অর্ধগোলাকার খিলানের ব্যবহারকে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব বলে মনে করা হয়।[১] মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রবেশপথের সাথে সঙ্গতি রেখে এই মসজিদের মিহরাবের সংখ্যাও তিনটি এবং কেন্দ্রীয় মহরাবটিও যথারীতি অপরাপর মিহরাব অপেক্ষা বৃহৎ পরিসরে নির্মিত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ দুটি আড়াআড়ি খিলান দ্বারা তিনটি বে তে বিভক্ত। এর গম্বুজ নির্মাণে পানদানতিভ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে মসজিদের চারিধার অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল বলে জানা যায় কিন্তু বর্তমানে এর আশেপাশে কোন প্রাচীর লক্ষ্য করা যায় না।

অলংকরণ:

বেরোয়ান মসজিদের অলংকরণ মুঘল স্থাপত্য অলংকরণ রীতি লক্ষ্য করা যায়। এর উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়াল মুঘলরীতিতে বিভিন্ন প্যানেলে বিভক্ত। এর কর্ণিশ বরাবর ও গম্বুজের ড্রামে মারলন নকশা দেখা যায়। মারলন নকশাগুলো সম্মুখ ভাগে সাপের ফনার মত কিছুটা বাকাঁনো। এই ধরনের বাঁকানো মারলন নকশা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মসজিদের গম্বুজগুলো উল্টানো পদ্মের উপর কলস ও পদ্ম কলির শীর্ষদন্ড দ্বারা অলংকৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ অলংকরণ নাই।

বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদনের প্রতিবেদকগণ এই মসজিদের আশেপাশে বহু কালো পাথর পড়ে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।[২] কিন্তু বর্তমানে এই মসজিদের আশেপাশে এরূপ কোন প্রকার পাথরের অস্তিত্ব নাই। তবে মসজিদটি যে বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে তার প্রমান পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ কালে এই মসজিদটির ব্যাপক সংস্কারের কথা উল্লেখ রয়েছে। [৩] এ ছাড়া বর্তমানে মসজিদটির সামনে একটি প্রশস্ত বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে এই মসজিদের পূর্ব দেয়াল অনেকখানি ঢাকা পরে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

বেরোয়ান মসজিদের এক আইল পরিকল্পনা, চর্তুকেন্দ্রীক গম্বুজ, বহিঃ দেয়ালের প্যানেল নকশা, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে মুঘল ঐতিহ্যের নিদর্শন। তবে মসজিদ অলংকরণে বাকাঁনো মারলন নকশার ব্যবহার ও প্রবেশদ্বারের অর্ধগোলাকৃতির খিলান মসজিদটির নির্মাণকাল অষ্টদশ শতকের শেষার্ধের সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করে।

শিলালিপি:

বর্তমানে বেরোয়ান মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর একটি লিপি পাওয়া যায়। লিপিটি নিম্নরূপঃ

আমিন পরামানিক, জমির পরামানিক, জামান পরামানিক

সংস্কার ১৩৭৫/১৪০৩

এই লিপিটি ছাড়াও আরো দুটি প্রস্তর লিপি এই মসজিদে ছিল বলে জানা যায় যা মসজিদ সংস্কারের সময় পলেস্তরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ।

মৃধার মসজিদ

চিত্র: ১৩

অবস্থান:

পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাজপাড়া গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত।

বর্ণনা:

এটি একটি আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এর চার কোনে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ব-বুরুজ। বুরুজগুলো ছাদের উপরে আরো কিছুদূর পর্যন্ত প্রলম্বিত। বর্তমানে পূর্ব দিকে এর প্রবেশপথ তিনটি। এর পশ্চিম দেয়ালে কিবলা নির্দেশক মিহরাবের সংখ্যা একটি।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

মসজিদটিতে নির্মাণকাল নির্দেশক কোন শিলালিপি নাই। তবে মসজিদ নির্মানে পাতলা ইটের ব্যবহার ও এর তিন গম্বুজ পরিকল্পনা দেখে এই মসজিদের নির্মাণকাল সতের শতকের শেষ বা আঠারো শতকের প্রথম ভাগ বলে মনে হয়।

শিলালিপি:

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের ওপর আরবিতে কালেমা তৈয়ব উৎকীর্ণ রয়েছে।

জানা যায় যে মসজিদটি বহু দিন মাটি চাপা পড়ে থাকার পর স্থানীয় জনগণ মাটি সরিয়ে মসজিদটি সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।[৪]

খানবাড়ি মসজিদ

চিত্র: ১৪

অবস্থান:

পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাজপাড়া গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদ সংলগ্ন এলাকা খানপাড়া নামে পরিচিত।

বর্ণনা:

এটি তিন গম্বুজ সম্বলিত মসজিদ। মূল মসজিদের আয়তন ১০.০৬ মিটার (উত্তর-দক্ষিণ) /৬.৪০ মিটার (পূর্ব-পশ্চিম)। মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা ১.৬০ মিটার। ভূমি থেকে মসজিদের উচ্চতা ৩.৬৫ মিটার। মসজিদ অবকাঠামোটি চার কোনায় চারটি অষ্টকোনাকার বুরুজ দ্বারা সংস্থাপিত। বুরুজগুলি মসজিদের ছাদ হতে আরো কিছুটা উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত। মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে এই তিন গম্বুজ মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথ তিনটি। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি মুঘল রীতি অনুযায়ী বাইরের দিকে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। মসজিদের প্রবেশপথের

Dhaka University Institutional Repository

খিলানগুলো চতুর্কেন্দ্রীক রীতিতে তৈরী। এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি জানালা রয়েছে। মসজিদ গাত্রের উল্লেখযোগ্য অলংকরণের মধ্যে রয়েছে এর মূল প্রবেশ পথের উপরের ও গম্বুজের বাইরের ষ্ট্যাকো নির্মিত লতা-পাতার নকশা।

বর্তমানে মসজিদটি সম্প্রসারনের ফলে এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে (বর্তমান আয়তন ২০.০৭/ ৯.৬০ মিটার)।

নির্মাণকাল:

মসজিদটিতে নির্মানকাল নির্দেশক কোন শিলালিপি নাই। এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও স্থুল অলংকরণ দৃশ্যে মসজিদটি উনবিংশ শতকের বলে মনে হয়।

শিলালিপি:

এর মূল প্রবেশ পথের উপরে আরবীতে কালেমা তৈয়বা উৎকির্ণ রয়েছে।

ভাঙ্গুরা জামে মসজিদ

অবস্থান:

মসজিদটি পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা উপজেলার ভাঙ্গুরা মৌজায় অবস্থিত।

বর্ণনা:

এটি একটি তিনগম্বুজ সম্বলিত মসজিদ। এক আইল বিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদের বর্তমান আয়তন ৫৪.৮৬/ ৫৮.২৯ মিটার। মসজিদের চার কোনে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। মিহরাবের সংখ্যা তিনটি এবং প্রস্তর নির্মিত। মিহরাবের প্রস্থ .৬৬ মিটার ও উচ্চতা ১.৩৭ মিটার। মসজিদটি ১৯৮০ সালে সংস্কার করা হয়। সংস্কারের সময় এর আদি বৈশিষ্ট্য আনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে তবে এর গম্বুজ গুলো এখনও আদি অবস্থায় আছে বলেই মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয়। মসজিদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে মাঝখানের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। গম্বুজের শীর্ষদন্ডগুলো উল্টানো পদ্মের উপর কলসদন্ড দ্বারা সুশোভিত।

নির্মাণকাল:

মসজিদটিতে কোন শিলালিপি নাই। স্থানীয় আধিবাসিদের মতানুসারে মসজিদটি ১৭৭৫ সনে নির্মিত। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও এটা অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে মনে হয়।

দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ

চিত্র: ১৫ , ১৫ক

অবস্থান:

দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদটি পাবনা সদর উপজেলার, দিলালপুরে আব্দুল হামিদ রোডের উত্তর পার্শ্বে দুলাই জমিদারদের পাবনা সদর উপজেলার বাড়ীর প্রাঙ্গনে অবস্থিত। মসজিদটি মূলতঃ পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নির্মিত হলেও বর্তমানে এটি জামি মসজিদ হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি পাবনা শহরের একটি প্রাচীন মসজিদ।

বর্ণনা:

মসজিদটি আয়তাকারে নির্মিত, এর দৈর্ঘ্য ৭.৬২ মিটার ও প্রস্থ ৫.৪৮ মিটার, .৯১ মিটার উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত এই মসজিদটির ভিত্তি হতে শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৭.৩১ মিটার। মসজিদের কোন পার্শ্ববুরুজ নাই শুধু প্যারাপেট যুক্ত ছাদের চারদিকে মোট ১০টি ক্ষুদ্র মিনার রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে এর প্রবেশ পথ তিনটি। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত উচু ও প্রশস্ত। প্রবেশদ্বারের ন্যায় এর মিহরাবের সংখ্যাও তিনটি এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত উচু ও প্রশস্তাকারে নির্মিত। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ একই রকম দ্বিকেন্দ্রীক খাঁজ খিলানের অর্ধগম্বুজের মধ্যে সংস্থাপিত। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ ও মিহরাবের খিলানগুলো

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধগোলাকার। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি জানালা রয়েছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের গম্বুজটি আড়াআড়ি খিলানের উপর পানদানতিভ দ্বারা সমর্থিত ও অর্ধগোলাকারে নির্মিত। মসজিদটির সম্মুখে পরবর্তী কালে ৬.০৯ মিটার প্রশস্ত একটি আচ্ছাদিত বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে।

অলংকরণ:

মসজিদের বাইরের দেয়ালে খুব বেশী অলংকরন নাই। অলংকরনে বিশেষ করে স্থাপত্যিক রেখাগুলোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মসজিদের প্রবেশ পথের আয়তাকারে ফ্রেমের উপরে লতাপাতা অলংকরণ রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানের চারিধারে এক সারি অবতল নকশা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বহিঃদেয়ালেও অবতল পাখা নকশার অলংকরণ ছিল। এই ধরনের অবতল নকশা ও পাখা নকশার ব্যবহার ১৭৬৭ সালে নির্মিত মুর্শিদাবাদের চক মসজিদে দেখা যায়। মসজিদের অভ্যন্তরের আড়াআড়ি খিলান ও মিহরাবের খিলান রেখা গুলোকে খাজকাটা নকশা ও ফুল, লতা, পাতা, কলকা নকশা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। নকশা গুলো পলেস্তরার তৈরী, হালে এগুলোকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে। গম্বুজের শীর্ষদন্ডটি উল্টানো কলসের উপর পদ্মকলির মটিফ যুক্ত। কলসগুলোর গায়ে ও চারকোনের ক্ষুদ্র বুরুজের শীর্ষে ফুলেল নকশা দেখা যায়।

নির্মান কাল:

মসজিদের নির্মানকাল সম্বন্ধে এখানে তেমন কোন লিপি নাই। তবে মসজিদের দক্ষিণে জমিদার আজিম উদ্দীন চৌধুরীর সমাধি আছে। পূর্বে এটি একটি কক্ষাকারে নির্মিত হয়েছিল পরবর্তী কালে কক্ষটি ভেঙ্গে পড়ায় বর্তমানে এখানে একটি সাধারণ বাধানো করব রয়েছে। কবরগাত্রে কোন শিলালিপি ছিল না। সম্ভবত: আজিম চৌধুরী নিজে অথবা তাঁর পুত্র হায়দার জান চৌধুরী কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। অলংকরণে ও পরিকল্পনায়ও এটি উনবিংশ শতকের ইমারত বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি:

মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশে, মিহরাবের উপরে ও দুইপার্শ্বে রং দিয়ে লেখা কিছু লিপি রয়েছে। তবে এর সবগুলোই কোরানের আয়াত।

দিলালপুর চৌধুরীবাড়ী জামে মসজিদটির নামে ৩ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। এর মধ্যে মসজিদের দক্ষিণে প্রায় পৌনে দুই বিঘার উপর রয়েছে একটি জলাশয়। মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণে একটি পারিবারিক গোরস্থান এবং এর সম্মুখে একটি অঙ্গন। মসজিদ অঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে বর্তমানে দুটি কামান প্রথিত আছে। পূর্বে এই কামান দুটি জলশয়ের মসজিদ সংলগ্ন বাঁধানো ঘাটের দুই পাশে প্রথিত ছিল। *জিলা পাবনার ইতিহাস* হতে জানা যায় যে, দুলাই জমিদার ফখরুদ্দীন আহলে আহসান আজিম উদ্দীন চৌধুরীর একটি তোষাখানা বা অস্ত্রাগার ছিল, তাতে বন্দুক, কামান, গোলা বারুদ, তরবারী, কুঠার, বর্শা হলঙ্গা, লাঠিসোটা ও বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয় অস্ত্রছিল।[৫] সম্ভবত: পাবনা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের সময় কৃষকদের পক্ষাবলম্বন করায় ইংরেজ সরকারের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। আজিম চৌধুরী পরাস্ত হয়ে ৪ বছর ফরাসি অধিকৃত চন্দন নগরে আত্মগোপন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬] দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদের সম্মুখের এই কামান দুটি আজও তার তোষখোনার স্মৃতি বহন করছে।

সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ

চিত্র: ১৬, ১৭ ভূমি নকশা: ৫

অবস্থান:

মসজিদটি পাবনা সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের সাদুল্লাহপুর গ্রামে সাদুল্লাপুর জমিদারবাড়ির অঙ্গনের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদটির দাগ নম্বর ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা:

সাদুল্লাহপুর মসজিদটি এক আইলে নির্মিত তিনগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। মূল মসজিদ ইমারতের দৈর্ঘ্য ১০.৩৬ মিটার ও প্রস্থ ৪.৮৭ মিটার, গম্বুজের শীর্ষ পর্যন্ত মসজিদের উচ্চতা ৭.৩১ মিটার। এর চার কোনে চারটি অষ্টকোনার পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। এছাড়া মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের উভয় দিকে দুটি করে মোট আটটি অপেক্ষাকৃত সরু সংলগ্ন স্তম্ভ দেখা যায়। মসজিদের প্রবেশ পথ তিনটি এর সবগুলোই মসজিদের পূর্ব দেয়ালে অবস্থিত। প্রবেশ পথগুলো অবতল কুলঙ্গীর মধ্যে স্থাপিত, কুলঙ্গীগুলো চর্তুকেন্দ্রীক খাজ-খিলানে নির্মিত হলেও এর প্রবেশ পথগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে ও দ্বিকেন্দ্রীক খিলানে নির্মিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি জানালা রয়েছে। পূর্বে এখানে পলেস্তরার জালি ছিল কিন্তু তা ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে সেই স্থানে লোহার জালি স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদের মিহরাবের সংখ্যা তিনটি এবং সমউচ্চতা সম্পন্ন। দুটি সংলগ্ন ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর বহু-খাঁজ খিলান সমন্বয়ে গঠিত এই মিহরাবগুলোর অবতলাংশ অষ্টকোনাকারে নির্মিত। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে প্রতিস্থাপিত। এর উচ্চতা ২.১৩ মিটার ও প্রস্থ ১.০৬ মিটার।

মসজিদের অভ্যন্তর দুটি আড়আড়ি খিলানে দ্বারা তিনটি অংশে বিভক্ত এবং গম্বুজগুলো পানদানতিভ দ্বারা সমর্থিত। গম্বুজ নির্মাণে অনুচ্চ ড্রাম ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের চারকোনের চারটি ও কেন্দ্রীয় মিহরাব ও প্রবেশপথের আটটি সংলগ্ন বুরুজের উত্থিত অংশ ছাড়াও আরও ১২টি .৭৩ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন ক্ষুদ্র বুরুজ রয়েছে। গম্বুজের শীর্ষদন্ড গুলো উল্টানো পদ্মর উপর কলস ও পদ্ম কলির মটিফ দ্বারা শোভিত। ক্ষুদ্র বুরুজগুলোতেও এই শীর্ষ দন্ড দেখা যায়।

অলংকরণ:

মসজিদের পূর্ব দেয়ালে প্যানেল নকশা রয়েছে। এছাড়া মসজিদের বহিঃদেয়ালের কর্নিশ ও গম্বুজের ড্রামে বাঁকানো মারলন নকশা দেখা যায়। মসজিদের অভ্যন্তরে শুধুমাত্র এর কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাবটিই অলংকৃত। এর আয়তাকার ফ্রেমের উপরের অংশে বাঁকানো মারলন নকশার পূনরাবৃতি ঘটেছে। মিহরাব খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুল ও লতা পাতার নকশা দেখা যায়।

নির্মাণকাল:

মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে এই মসজিদের নির্মান কাল ১২২৪ হিজরী / ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানা যায়।

শিলালিপি:

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে একটি কষ্টি পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে। লিপিটির ভাষা ফার্সী এবং নাস্তালিক রীতিতে লেখা। ৬ লাইনে উৎকীর্ণ এই শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ:[৭]

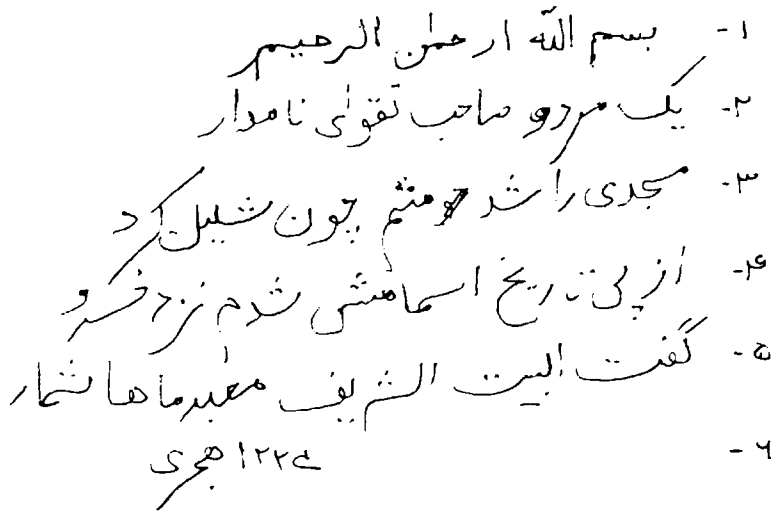

অনুবাদ:

১। বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম

২। পূর্ণবান ও ধর্মভীরু এক বিশিষ্ট ব্যক্তি

৩। একটি উত্তম মসজিদ যুগের জন্য স্থাপন করলেন

৪। বাদশাহ্‌র নিকট তারিখ জানার জন্য গেলাম

৫। বলল বায়তুল শরিফ আমাদের প্রার্থনা গৃহের গণনা

৬। হিজরী ১২২৪

Dhaka University Institutional Repository

দুলাই জামে মসজিদ

চিত্র: ১৮, ১৯ ভূমি নকশা: ৬

অবস্থান:

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার দুলাই গ্রামে দুলাই জমিদারবাড়ির বেষ্টনী প্রাচীরের ভেতর, মূলবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে দুলাই জামে মসজিদটি অবস্থিত। এর পূর্ব প্রান্তে একটি অঙ্গন, অঙ্গনের পরেই মসজিদের একই অক্ষে জমিদারবাড়ির প্রবেশতোরন এবং দক্ষিণে একটি বর্গাকৃতির জলাশয় রয়েছে।

বর্ণনা:

মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এক আইলের একটি আয়তাকার ইমারত। মসজিদের বহিঃদেয়ালের দৈর্ঘ্য ১৪.৩২ মিটার, প্রস্থ ৬.৭০ মিটার এবং উচ্চতা গম্বুজ পর্যন্ত ৭.৯২ মিটার। মসজিদের চার কোনে চারটি পাশ্ব বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের উপরে প্রায় ১.২১ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং শীর্ষে নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্র গম্বুজ। চার ধারের এই পার্শ্ব বুরুজগুলো ছাড়াও মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের দুই পাশে ও কেন্দ্রীয় মিহরাবের দুপাশে দুটি করে মোট আটটি সংলগ্ন স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে এই স্তম্ভ গুলোও ছাদ হতে ১.২০ মিটার উপরে যেয়ে শেষ হয়েছে। মসজিদের প্রবেশপথ তিনটি এর পূর্ব দেয়ালে অবস্থিত। প্রবেশ পথগুলো অবতল কুলঙ্গির ভিতর স্থাপিত। কুলঙ্গীর খিলান সমূহ বহু খাজ বিশিষ্ট চতুর্কেন্দ্রীক হলেও প্রবেশপথের খিলান গুলো দ্বিকেন্দ্রীক ও ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি জানালা রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়াল বিভিন্ন প্যানেলে বিভক্ত। এর কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি একটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের প্রবেশপথের সংখ্যা অনুযায়ী এর মিহরাবের সংখ্যাও তিনটি। তিনটি মিহরাবই ২.৪৩ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন এবং একই রকম জাকালো নকশায় অলংকৃত। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক দেয়ালে দুটি করে মোট আটটি কুলঙ্গী রয়েছে।

মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা তিনটি। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সামান্য বৃহদাকারে নির্মিত। মসজিদের অভ্যন্তরে আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত দুটি খিলানের উপর পানদানতিভের সাহায্যে গম্বুজগুলো নির্মিত হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণে মুঘল রীতি অনুযায়ী অষ্টকোনাকার ড্রামের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের শীর্ষদন্ডটি সম্পূর্ণ পিতলের তৈরী। উল্টানো পদ্মের উপর তিনটি কলস ও একটি পদ্মকলির সমন্বয়ে শীর্ষদন্ডটি নির্মিত হয়েছে। মসজিদের ছাদের চারধারে অনুচ্চ প্যারাপেট লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে মসজিদটির সম্মুখে ৬ মিটার প্রশস্ত একটি বারন্দা সংযোজিত হয়েছে। বারান্দাটির ছাদ চারটি করে গুচ্ছ-স্তম্ভ সহযোগে মোট ১৪টি গুচ্ছ-স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত।

অলংকারণ:

মসজিদের পূর্ব দেয়ালজুড়ে মুঘল রীতির প্যানেল নকশা দেখা যায়। মসজিদ অলংকরণে স্থাপত্যিক রেখাগুলোকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মসজিদের বহিঃদেয়ালে প্যারাপেটের চারধারে এবং গম্বুজের ড্রামের চারিদিকে সাপের ফনার মত বাকাঁনের মারলন নকশা দেখা যায়। এছাড়া সংলগ্ন বুরুজ গুলোর শীর্ষে আধাফোটা পদ্ম ও শীষদন্ডে কলস ও পদ্মকলির ব্যবহার মসজিদটির বহিঃদেয়ালের উল্লেখ যোগ্য অলংকরণ। অভ্যন্তরীন অলংকরনের মধ্যে মিহরাবগুলিই প্রধান আকর্ষন। মিহরাবগুলি একটি আয়তাকারে ফ্রেমের মধ্যে নির্মিত। মিহরাব খিলানগুলো চতুর্কেন্দ্রীক এবং খাঁজকাটা খিলান নকশায় অলংকৃত এবং জোড়া স্তম্ভ হতে উত্থিত। মিহরাব ফ্রেমের উর্ধ্বাংশে একসারি বাঁকানো মারলন নকশা রয়েছে। এর স্প্যানড্রিলগুলো লতা ও ফুল নকশায় অলংকৃত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের জানালাগুলোতে পূর্বে জালি ছিল বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মানকাল:

দুলাই জামে মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর একটি শিলালিপি আছে। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটির নির্মান কাল ১২১৭ হিজরী অর্থাৎ ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ।

শিলালিপি:

শিলালিপিটি মর্মর পাথরের উপর কালো পাথর বসিয়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। লিপির ভাষা ফার্সী এবং নাস্তালিক রীতিতে লিখিত। চার লাইনে উৎকীর্ণ লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

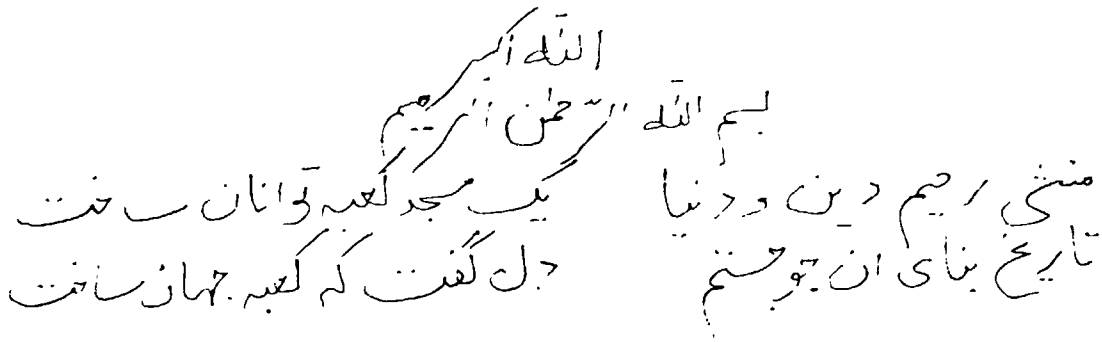

অনুবাদ:

১। আল্লাহ আকবার

২। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

৩। মুন্সী রহিমুদ্দীন ওয়া দুনিয়া কাবার মত সুদৃঢ় একটি মসজিদ নির্মান করেছেন।

৪। এর তারিখ অনুসন্ধান করলে মন বললো যে দুনিয়ায় কাবার ন্যায় নির্মিত।

শিলালিপি হতে মসজিদটির নির্মাতার নাম পাওয়া যায় মুন্সি রহিমুদ্দীন এবং মসজিদটির নির্মান তারিখ এর শেষ লাইনে ক্রোনগ্রামে দেওয়া আছে ১২১৭ হিজরী / ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মন্দির

শেঠের বাংলা

চিত্র: ২০, ২১ ভূমি নকশা: ৭

অবস্থান:

চাটমোহর উপজেলা সদর হতে ১২.৭০ কিলোমিটার পূর্বে হান্ডিয়াল গ্রামে হান্ডিয়াল জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণে বাংলা মন্দিরটি অবস্থিত। হান্ডিয়াল ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে এর অবস্থান .৪০ কিলোমিটার।

বর্ণনা :

দোচালাকারে নির্মিত এটি একটি ইটের মন্দির। এর আয়তন ৩.৭৪ /২.২৮ মিটার। উচ্চতা প্রায় ৩.১৫ মিটার। ইমারতটির চারকোনে চারটি ইটের চতুষ্কোনাকার স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো মন্দির দেয়াল হতে কিছুটা ভিতর দিকে ঢুকানো এবং ব্যান্ড যুক্ত। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ করে চালা মন্দিরগুলোতে এই ধরণের স্তম্ভের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রীতি। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালে একটি মাত্র প্রবেশপথ, প্রবেশ পথটি দুটি সরু-স্তম্ভের উপর বহুখাজ বিশিষ্ট খিলানে নির্মিত।

অলংকরণ:

মন্দিরের পশ্চিম দেয়াল অত্যন্ত জাকালো ভাবে অলংকৃত। অলংকরণে তিন ধরণের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে। (ক) খোদাই ইট (খ) ছাঁচে তৈরী পোড়ামাটির অলংকরণ ও (গ) হাতে তৈরী পোড়া মাটির অলংকরণ। মন্দিরের কোনের স্তম্ভগুলোতে দুই ব্যান্ডের মাঝখানে খোদাই ইটে জ্যামিতিক ও ফুলের লতা নকশার অলংকরন দেখা যায়। এছাড়া পশ্চিমের সমগ্র দেয়ালকে

Dhaka University Institutional Repository

মোট সাতটি ফ্রেমে বিভক্ত করা হয়েছে। ফ্রেমের উপরের অংশগুলো দোচালার বাঁকের সাথে সঙ্গতি রেখে কিছুটা বাঁকা ভাবে তৈরী। প্রবেশ খিলানকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ফ্রেমগুলোর প্রথমটিতে ছাঁচে তৈরী পোড়ামাটির ফলকে ফুলের এক সারি নকশা দেখা যায়। এর দ্বিতীয় ফ্রেমকে কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্যানেলগুলোতে দূর্গা, কালী সহ বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে। এরপরের ফ্রেমটি মূলতঃ একটি সরু সংলগ্ন স্তম্ভ আকারে নির্মিত। এতে একসারি ব্যান্ড নক্শা দেখা যায়। দুইটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অবতল অংশ খোদাই ইটে জ্যামেতিক নকশায় অলংকৃত। এর পরের ফ্রেমে আবার একসারি ফুলের লতানো নক্শা রয়েছে। পরবর্তী ফ্রেমটিতে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সর্বশেষ ফ্রেমটি ফুলের নক্শায় অলংকৃত। মন্দিরের খিলানের প্যানড্রিলে পোড়ামাটির ফলকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ছাড়া মন্দির দেয়ালের একেবারে নীচে দুই সারি পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে। এতে নৃত্যরত নারীপুরুষ, মিছিল, অশ্বারোহী যোদ্ধা, ফিরিঙ্গী যোদ্ধা ইত্যাদি দৃশ্য দেখা যায়। এক সময় এই মন্দিরের প্রবেশপথে খোদাই কাঠের অলংকৃত দরজা ছিল।[৮] বর্তমানে এই দরজা দেখা যায় না।

নির্মাণকাল:

শেঠের বাংলা দোচালা মন্দিরটিতে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী এই ইমারতটি ১৭০১ শতাব্দী / ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এই বাংলা ও তৎসংলগ্ন বাগানবাড়ি নবাবী আমলের প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের। জগৎ শেঠ ব্যবসার্থে এই কুঠিবাড়ি এবং তার গুরুদেবের আসনের জন্য এই বাংলা নির্মাণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন ব্রজরাম দাসের পুত্র জগৎ শেঠের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং মালিকের জন্য তার নামে এখানে বাংলা কুঠিটি নির্মাণ করেন। আবার অনেকের মতে ব্রজরাম দাস প্রচুর অর্থ উপার্জনের কারণে শেঠ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মতান্তরে এও জানা যায় যে পর্তুগীজদের নিকট হতে এটি ক্রয় করে ইংরেজদের সহায়তা দানের জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেঠকে এই কুঠি দান করেন। এবং শেঠের

Dhaka University Institutional Repository

নামে নিস্কর জমি হিসাবে তা রেকর্ড ভুক্ত হয়।[৯] এই সবই কিংবদন্তী এবং এদের কোন মতই গ্রহন যোগ্য নয়। তবে মন্দিরটি ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। নাজিমুদ্দীন আহমেদের মতানুযায়ী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল সীতারাম।[৯ক]

শিলালিপি:

এই মন্দিরে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। চার লাইনে উৎকীর্ণ এই লিপির পাঠ নিম্নরুপ :

বিধুসুন্যসম্ভাবনি সংখ্যা

সাকে ব্রজরাম দাসস্য সু।

তেন গেহেন্দু কৃত হিতার্থায়

বদেবতয়ো পূর্ব্বমিতা বেদমনয়ত।[১০]

অর্থাৎ ১৭০১ শকাব্দে (১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল।

বোঁথর শিব মন্দির

চিত্র: ২২ ভূমি নকশা: ৮

অবস্থান :

চাটমোহর উপজেলা সদর হতে .৮০ কিলোমিটার উত্তরে এবং চাটমোহর ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রায় ১.৬০ কিলোমিটার পূর্বে বোঁথর গ্রামে মন্দিরটি অবস্থিত, গ্রামের নামানুসারে মন্দিরটি বোঁথর শিব মন্দির নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা :

মন্দিরটি বর্গাকারে নির্মিত সূউচ্চ শিখর যুক্ত একটি রেখা ধরনের মন্দির। এর বাইরের পরিমাপ ৩.১০ × ৩.১০ মিটার, অভ্যান্তরের পরিমাপ ২.০০ × ২.০০ মিটার। এর দেয়াল .৫৫ মিটার পুরু। ভূমি হতে শীর্ষ পর্যন্ত এর উচ্চতা ৭.৩০ মিটার। মন্দিরের শিখরটি পিরামিডাকারে নির্মিত। কর্ণিশ হতে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত শিখরের প্রতিটি দিকে উলম্ব উদ্গত অংশ রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ও অর্ধগোলাকৃতির খিলান সহযোগে নির্মিত। বর্তমানে মন্দিরের সামনে একটি বারান্দা ও পূর্ব দিকে একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের শীর্ষদন্ডটি পিতলের তৈরী এর সর্বনিম্নে একটি অমলক, এরপর দুটি কলস ও সর্বশীর্ষে একটি দন্ড সহযোগে নির্মিত। মন্দিরের ভিত্তিটি এক সময় ১.৫২ মিটার উচু ছিল বলে জানা যায়। মন্দিরের নির্মাণ উপাদান হিসাবে পাতলা ইট ও চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ:

বোঁথর শিব মন্দিরটিতে তেমন কোন অলংকরণ নাই। এর প্রবেশ পথের উপরে গণেশ মূর্তি সহ অন্যান্য দেব মুর্তির প্রতিকৃতি রয়েছে।

নির্মাণকাল:

মন্দিরের নির্মান কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। মন্দিরের অভ্যন্তরের বেদীতে একটি লিপি রয়েছে। এই লিপি অনুসারে মন্দিরটি ১৩১৩ বঙ্গাব্দ/১৯০৬ খ্রি. পূণঃসংস্কার করা হয়। স্থানীয় পুজারীদের মতে মন্দিরটি ১২৭২ বঙ্গাব্দে/১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আরেকবার সংস্কার করা হয়ে ছিল। সম্ভবতঃ মন্দিরটি আরও আগে আনুমানিক অষ্টদশ শতকে নির্মিত হয়।

শিলালিপি:

মন্দিরটিতে বর্তমানে একটি মাত্র লিপি আছে। মন্দির অভ্যন্তরে লৌহ নির্মিত বেদীর গায়ে উৎকীর্ণ এক লাইনের এই লিপিটি সম্পূর্ণ পাঠযোগ্য নয় তবে এর শেষে পূনঃসংস্কার ১৩১৩ পড়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বোঁথর শিব মন্দিরে বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গ পুজিত হয়। যদিও মন্দিরগাত্রের দেবদেবীদের মধ্যে কোন শিবমূর্তি দেখা যায় না।

কুমার পাড়া বৈদ্যনাথের মন্দির

চিত্র: ২৩

অবস্থান :

কুমার পাড়া বৈদ্যনাথের মন্দিরটি চাটমোহর উপজেলা সদর হতে প্রায় .৮০ কিলোমিটার উত্তরে এবং চাটমোহর ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রায় ১.৬০ কিলোমিটার পূর্বে কুমার পাড়া গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

বর্ণনা :

চৌচালাকারে নির্মিত এটি একটি বর্গাকার মন্দির। এর বহিঃভাগের পরিমাপ ৪.৫০ x ৪.৫০ মিটার, এর অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৩.১০ x ৩.১০ মিটার, ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১০ মিটার। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করে খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানগুলো চতুকেন্দ্রীক। মন্দিরের চৌচালার কর্ণিশগুলো বক্রভাবে নির্মিত। এর ছাদ নির্মাণে ক্রমোপূরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তর হতে এর প্রতিটি বেড় দৃশ্যমান।

অলংকরণ :

কুমার পাড়া বৈদ্যনাথের মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে কোন নকশা বা পোড়ামাটির অলংকারণ দেখা যায় না। তবে এর দক্ষিণ দেয়ালে প্রবেশ পথের উপরে শিব-পার্বতীর আবক্ষমূর্তি রয়েছে। এর কর্ণিশের চারিদিকে একসারি পাড় নকশা দৃশ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল :

মন্দিরটির নির্মান কাল সম্বন্ধে জানা যায় না, স্থানীয় মতানুসারে এটি অষ্টদশ শতকের দিকে নির্মিত। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মন্দিরটি যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পরে স্থানীয় জনগনের প্রচেষ্টায় এর সংস্কার করা হয়েছে।

মন্দিরটিতে বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গ পুজিত হয়।

এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ইমারত নয়।

বিশ্বাসবাড়ি শিব মন্দির

চিত্র: ২৪

অবস্থান:

চাটমোহর উপজেলা সদর হতে .৮০ কিলোমিটার উত্তরে বড়াল নদীর তীরে বোঁথর গ্রামের বিশ্বাসবাড়ির প্রাঙ্গণে মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা:

এটি একটি চৌচালা শিব মন্দির। মাটি থেকে কিছুটা উচু বর্গাকার ভিত্তির উপর বর্গাকারে নির্মিত এই মন্দিরের বাইরের দিকের আয়তন ৩.১০ x ৩.১০ মিটার। মন্দিরের কর্নিশ বক্রাকারে নির্মিত এবং এর ছাদ চৌচালা। মন্দিরের একটিমাত্র প্রবেশপথ এর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। প্রবেশপথটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান সহযোগে গঠিত। এই খিলান পথের উপরে দুইটি ফ্রেম রয়েছে। এছাড়া এর চৌচালার বক্রকর্ণিশের নীচে একসারি ক্ষুদ্র ব্রাকেটও পরিলক্ষিত হয়।

অলংকরণ:

বিশ্বাসবাড়ি শিব মন্দিরটির মূল অলংকরণ দেখা যায় এর দক্ষিণ দেয়ালে প্রবেশপথের উপরে। এর দক্ষিণ দেয়ালে বাঁকানো কর্ণিশের নীচে পলেস্তারায় নির্মিত তিনটি দেব মুর্তি চোখে পড়ে। এদের মাঝখানেরটি শিব এবং এর দুই পাশে গণেশ ও কার্তিকের মুর্তি । মন্দিরের প্রবেশপথের ঠিক উপরে আরো তিনটি দেব মুর্তি রয়েছে এগুলোও শিব-পার্বতির মুর্তি। এছাড়া প্রবেশপথের

Dhaka University Institutional Repository

দুইপাশে স্প্যানড্রিলে ছুটন্ত ঘোড়ার অলংকরণ রয়েছে। মন্দিরের সমস্ত অলংকরণ পলেস্তরায় তৈরী।

নির্মাণকাল:

বিশ্বাসবাড়ি শিব মন্দিরটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যদৃশ্যে একে উনবিংশ শতকের মন্দির বলে অনুমিত হয়।

ঠাকুরবাড়ি মঠ

চিত্র: ২৫

অবস্থান :

ফরিদপুর উপজেলা সদর হতে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গুরা-ফরিদপুর সড়কে বেড়হাউলিয়া বাজার, এর দক্ষিণ দিকে চিথুলিয়া গ্রাম, এই গ্রামের ঠাকুরবাড়িতে মঠটি অবস্থিত। এটি ধর্মগুরু ঠাকুর শম্ভুচাঁদের আখড়া নামে খ্যাত।

বর্ণনা :

মঠটি একটি তিন ফুট উচু ভিত্তির উপর নির্মিত। কয়েক ধাপে নির্মিত এই মঠের সর্বনিম্নাংশটি বর্গাকার। এর পরিমাপ ৪.৫৭ x ৪.৫৭ মিটার। এর চার দিকে চারটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথ গুলো অর্ধগোলাকারে নির্মিত। মঠের দেয়ালের চার কোনায় তিনটি করে সরু করেথিয় কলামের গুচ্ছ প্রবিষ্ট ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর প্রথম তলার উচ্চতা ৪.৫৭ মিটার। এর দ্বিতীয় তলটি গোলাকারে নির্মিত। এ উচ্চতা ৩.৬৫ মিটার। এই গোলাকার দেয়ালের চারিদিকে মোট আটটি চতুর্কেন্দ্রীক কৌনিক খিলান রয়েছে। এই খিলানগুলো সরু করেন্থিয় স্তম্ভের উপর অর্ধগোলাকার খিলানের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। এর পশ্চিম দিকের একটি খিলান ছাড়া সমস্ত খিলানই বদ্ধ আকারে নির্মিত। এই গোলাকার কক্ষের উপরে এর কর্ণিশটি

Dhaka University Institutional Repository

চতুস্কোনাকারে নির্মিত। কর্ণিশটি প্রতিটি কোনে ক্রমোসরু হয়ে ধাপে ধাপে ইমারতের গোলাকার গোত্রে এসে মিশেছে। এই কর্ণিশের উপরে অনুচ্চ ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে অষ্টকোনাকার গম্বুজ। এই গম্বুজের চার কোনায় রয়েছে ষড়ভূজের চারটি উদ্‌গত অংশ, সম্ভবত: এগুলো পূর্বে শিখরাকারে নির্মিত হয়েছিল। গম্বুজের শীর্ষ দেশে প্রায় .৭৬ মিটার ব্যাসের একটি শিখর রয়েছে। এই শিখরটি অষ্টকোনাকারে নির্মিত। এর প্রতিটি দিকে অর্ধগোলাকৃতির খিলান নকশার ভেতর ভেনিশিয় জানালার নকশা করা আছে। শিখরটিও গম্বুজ আচ্ছাদিত। অষ্টকোনাকার এই গম্বুজের কোনগুলো নীচের খিলানের সাথে সমন্বয় সাধন করে কিছুটা নীচের দিকে নামানো, যা গম্বুজটিকে অনেকটা ছাতার আকৃতি দান করেছে।

অলংকরন:

মঠটির নীচের তলার বহিঃদেয়ালে প্যানেল নক্‌শা, দ্বিতীয় তলার খিলান নক্‌শা ও শিখরের ভেনিশীয় জানালার নক্‌শা ছাড়া আর কোন অলংকরন নাই।

নির্মাণকাল:

মন্দিরটিতে কোন নির্মাণ তারিখ নাই। ঠাকুর শম্ভুচাঁদ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (১৮৮০ ইং)৭২ বছর বয়সে মারা যান। জানা যায় যে , তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাধুচাঁদ ঠাকুর পিতার সমাধির উপর এই মঠ নির্মাণ করেন।[১১] সে অনুযায়ী এই মঠের নির্মাণকাল উনবিংশ শতকের শেষপাদে অথবা বিংশশতকের প্রথম দিকে বলে ধরা যায়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের দিক দিয়েও এটি উনবিংশ শতকের নির্মাণ বলে মনে হয়। এই মঠের পাশে একই রকম উচু আর একটি মঠ ছিল । এটি ছিল সাধুচাঁদ ঠাকুর ও তার স্ত্রীর সমাধি। বর্তমানে এই মঠটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে।

মঠটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

নেছড়া পাড়া মঠ

চিত্র: ২৬

অবস্থান :

ফরিদপুর উপজেলা সদর হতে ১ কিলোমিটার পশ্চিমে, ফরিদপুর ইউনিয়নের নেছড়া পাড়া গ্রামে একটি মঠ রয়েছে। মঠটি বড়াল নদীর দক্ষিণে ও ভাঙ্গুরা ফরিদপুর সড়কের উত্তর দিকে একটি গোরস্থানে ভিতর অবস্থিত। পূর্বে এখানে শ্মশান ছিল বলে জানা যায়।

বর্ণনা:

এটি একটি বর্গাকার ইমারত। এর পরিমাপ ৫.৪৮ x ৫.৪৮ মিটার। মঠটিতে চারিদিকে প্রদক্ষিণ পথ বিশিষ্ট একটি গর্ভগৃহ রয়েছে। গর্ভগ্রহের পরিমাপ ৩.৬৫ x ৩.৬৫ মিটার। গর্ভগৃহের উপর একই পরিমাপে নির্মিত হয়েছে এর একমাত্র রত্ন শিখরটি । এর উচ্চতা ৪.২৬ মিটার। এর উপরে একটি অর্ধ গোলাকার গম্বুজ রয়েছে। শিখর সহ মঠটির উচ্চতা প্রায় ৭.৬২ মিটার। মঠটির প্রদক্ষিণ পথের ছাদটি সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। পূর্বে এই প্রদক্ষিণ পথের চারদিকে তিনটি করে স্তম্ভ সহযোগে চারটি করে খিলান পথ নির্মিত ছিল। বর্তমানে শুধুমাত্র এর স্তম্ভ ভিত্তি টুকুই টিকে আছে। গর্ভগ্রহের প্রবেশ পথটি পূর্বদিকে অবস্থিত। মঠের ভেতরে ও বাইরে পলেস্তরার আস্তরণ রয়েছে।

অলংকরণ:

মঠটি অত্যন্ত সাদাসিদা ভাবে নির্মিত। এর বাইরের ও ভেতরের দেয়ালে কোন অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায় না।

নির্মাণকাল:

মঠটির সাদামাটা ও সরল নির্মান শৈলী দেখে একে উনবিংশ বিংশ শতকের নির্মাণ বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গড়ুরি মন্দির

চিত্র: ২৭

অবস্থান:

পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার দেবোত্তর ইউনিয়নের অধীনে মন্দিরটি গড়ুরি গ্রামে অবস্থিত। গড়ুরি বাজার হতে .৪০ কিলোমিটার পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের মধ্যে মন্দিরটির সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্ণনা:

এটি একটি আয়তাকার মন্দিও; আয়তনে ৪.৭৫ মিটার/ ৩ মিটার। মন্দিরের তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে। প্রবেশপথের সম্মুখে একটি বারান্দার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টি গোচর হয়। মন্দিরটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্থানীয় বর্ষিয়ানদের মতে মন্দিরটি জনৈক গোপাল চন্দ্র সাহা আনুমানিক ১৩০৭ বঙ্গাব্দে[১২] মন্দিরটি নির্মান করেন।

গোসাই বাড়ি মন্দির

অবস্থান:

মন্দিরটি পাবনা সদর উপজেলার মালিগাছা ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। জায়গাটি পাবনা শহর থেকে আট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে।

বর্ণনা:

মালিগাছার গোসাই বাড়ি মন্দিরটি বর্গাকার ও দ্বিতল। বাইরে থেকে মূল মন্দিরের পরিমাপ ৭.৫০ / ৭.৫০ মিটার। অভ্যন্তর ভাগ হতে গর্ভগৃহের আয়তন ৩.৫০/৩.৫০ মিটার এবং বারান্দা ২.২৫/৩.৫০ মিটার। এর নীচের তলটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হলেও উপরের তলার কিছু অংশ এখনও টিকে আছে। দ্বিতীয় তলাটিও বর্গাকারে নির্মিত এবং নীচের তলার গর্ভগৃহের

Dhaka University Institutional Repository

উপরে একই আয়তনে নির্মিত। মন্দিরের এই অংশটি সম্ভবত চারচালাকারে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এর চারচালা ছাদের উপরের অংশটি ভেঙ্গে গেলেও ভিতরের বৃত্তাকার অংশ বিশেষ এখনও দৃশ্যমান। মন্দিরের চারদিকের বারান্দার ছাদ ভেঙ্গে পরায় এর চার কোনায় কোন রত্ন বা শিখর ছিল কিনা তা জানা যায় না। বর্তমানে মন্দির গাত্রে কিছু প্যানেল নকশা ছাড়া আর কোন অলংকরণ দেখা যায় না। মন্দির নির্মাণে পাতলা ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, সপ্তদশ শতকে এই এলাকায় জগন্নাথ ও শিলনাথ নামে দুইজন সাধু বাস করতেন। জগন্নাথের মৃত্যুর পর তার স্মৃতিরক্ষার্থে গোসাই সন্ন্যাসী নামে জনৈক ব্যক্তি এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সাধু গোসাইয়ের নামানুসারেই পরবর্তীতে মন্দিরটি 'গোসাই বাড়ি' মন্দির নামে পরিচিতি লাভ করে।

হেমরাজপুর শিব মন্দির

চিত্র: ২৮

অবস্থান:

হেমরাজপুর শিব মন্দিরটি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় অবস্থিত। উপজেলা সদর হতে মন্দিরটি প্রায় ৪.৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে হেমরাজপুর গ্রামে অবস্থিত। জানা যায় যে হেমরাজপুরের জমিদার তাদের পারিবারিক ব্যবহারের জন্য মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন। এখানে একটি জমিদারবাড়িও ছিল কিন্তু বর্তমানে এর কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নাই।

বর্ণনা:

এটি একটি চার চালা ধরনের মন্দির। মন্দিরটির বাইরের আয়তন ৪.৭০মিটার /৪.৭০ মিটার এবং ভিতরের ২.৫০ মিটার /২.৫০ মিটার। এর উত্তর ও পূর্ব দিকে একটি করে খিলান পথ রয়েছে। মন্দিরের চালের নিম্নাংশে সুঢৌল বাঁক রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে ও দুই পাশে পলেস্তরার জ্যামিতিক নকশা এবং পোড়ামাটির নকশা দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

মন্দিরটিতে কোন নির্মাণ তারিখ নাই। তবে নির্মাণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি আঠারো শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।[১৩]

হেমরাজপুর দূর্গা মন্দির

চিত্র:

অবস্থান:

সুজানগর উপজেলার হেমরাজপুর গ্রামে আর একটি মন্দির রয়েছে। এটি হেমরাজপুর দূর্গা মন্দির নামে পরিচিত।

বর্ণনা:

এটি একটি সমতল ছাদের মন্দির। বাইরের দিক থেকে এর আয়তন ৮.২০ মিটার / ৭.২০মিটার। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দুটি আচ্ছাদিত বারান্দা রয়েছে। বারান্দার পরিমাপ ৬.৩০ মিটার/ ১.৯০ মিটার। মন্দিরে প্রবেশের জন্য এর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দুটি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। এছাড়া এর বারান্দা দুটিতে প্রবেশের জন্য তিন খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ আছে।

মন্দিরের ভেতরে বা বাইরে কোন অলংকরণ চোখে পরেনা। দেয়ালে চুন-সুরকির আস্তর রয়েছে।

নির্মাণকাল:

মন্দিরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান দৃষ্টে একে হেমরাজপুর দূর্গা মন্দিরের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গণেশ মন্দির

চিত্র: ২৯

অবস্থান:

পাবনা সাথিয়া উপজেলার তলট গ্রামে গণেশ মন্দিরটি অবস্থিত। উপজেলা সদর হতে এর দূরত্ব ৪.০৮ কিলোমিটার পূর্বে করন্জা ইউনিয়নে।

বর্ণনা:

এটি একটি অষ্টভূজাকৃতির শিখর ধরনের মন্দির। মন্দিরটির বাইরের দিকের পরিমাপ ৫.৮০ মিটার/ ৫.৮০ মিটার এবং ভিতরের পরিমাপ ২.৬০ মিটার /২.৬০ মিটার। এর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে একটি করে অর্ধগোলাকৃতির খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। মন্দিরের প্রত্যেক কোনে কর্ণিশ পর্যন্ত বিস্তৃত সংযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো কর্ণিশের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষুদ্র শিখরাকারে শেষ হয়েছে। মন্দিরের কর্ণিশ ধনুকের মত বক্রতা বিশিষ্ট। এই ধরনের অষ্টকোনাকার শিখর ধরনের মন্দির বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বেশী দেখা যায় তবে পাবনা জেলা সাথিয়া উপজেলার গণেশ মন্দিরের সাথে মাদারীপুর জেলার রাজইর উপজেলার খালিয়ায় অবস্থিত কালীচরন রায়ের সমাধি মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশপথগুলো অর্ধবৃত্তাকার খিলান দ্বারা তৈরী।

অলংকরণ:

এক সময় মন্দিরের বহিঃ দেয়ালে স্ট্যাকো দ্বারা তৈরী জীবজন্তু, দেবদেবী ও ফুল-লতা নকশায় অলংকৃত ছিল। বর্তমানে এর দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশপথের উপরে একটি বড় আকারের দূর্গা ও গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

মন্দিরটিতে এর নির্মাণকাল নির্দেশক কোন লিপি নাই। স্থানীয় জনগনের মতে, মন্দিরটি তলটের জমিদার হিমাংশুধর রায় কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে মন্দিরটি উনবিংশ শতকের নির্মাণ।

পয়দা পঞ্চরত্ন মন্দির

চিত্র: ৩০

অবস্থান:

পাবনা সদর উপজেলা হতে আট কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত গয়েশপুরের পয়দা গ্রামে মন্দিরটি অবস্থিত। এটি পয়দা জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণে নির্মিত।

বর্ণনা:

বর্গাকার এই মন্দিরটির বারান্দা সহ প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ মিটার। মন্দিরে প্রবেশের জন্য এর দক্ষিণ দিকে বারান্দায় তিন খিলান বিশিষ্ট একটি প্রবেশপথ রয়েছে। খিলানগুলো বহু-খাজ বিশিষ্ট। এর কর্ণিশ সুঢৌল বাঁক যুক্ত। মন্দিরের ছাদের চার কোনে চারটি ক্ষুদ্র ও মাঝখানে একটি আপেক্ষাকৃত বড় চারচালা শিখর নির্মিত হয়েছে। এই শিখর বা রত্নগুলো চারদিকে খিলান দ্বারা উন্মুক্ত । এর চালা গুলো সূচালো ও কর্ণিশ বক্র। পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরটি এ ধরনের চারচালা শিখরযুক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অলংকরণ:

মন্দিরের মূল অলংকরণ এর ফাসাদ জুড়ে রয়েছে। এর তিন খিলান প্রবেশদ্বারের চার পাশে এক সারি পোড়ামাটির চিত্রফলক দেখা যায়। বর্তমানে অধিকাংশ ফলক খসে পরলেও খিলানের উপরে ময়ুর বাহনে বসা তিন মাথা বিশিষ্ট ব্রহ্মা, নন্দীর (ষাঁড়) পিঠে বসা জটাধারী শিব, সর্পের সাথে যুদ্ধরত নারী, মকরের সাথে যুদ্ধরত নারী, বীনা হাতে সরস্বতী ইত্যাদি চিত্রফলক এখনও

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়। মন্দিরের শিখরগুলোর খিলানের চারপাশে প্যানেল ও কর্ণিশের নীচে ব্যান্ড নকশা রয়েছে।

নির্মাণকাল:

মন্দিরটিতে নির্মাণকাল নির্দেশক কোন লিপি নাই। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ অনুসারে একে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের নির্মাণ বলে মনে হয়।

পয়দা আহ্নিক মন্দির

চিত্র: ৩১

অবস্থান:

আহ্নিক মন্দিরটি পয়দা পঞ্চরত্ন মন্দিরের একই আঙ্গিনায় উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত।

বর্ণনা:

এটিও একটি দ্বিতল মন্দির। এর নীচের কক্ষটি আয়তাকারে নির্মিত এবং এর উপরে একই আয়তনে নির্মিত হয়েছে একটি দোচালা ঘর। মন্দিরে প্রবেশের জন্য এর দক্ষিণ দিকে বহু-খাজ বিশিষ্ট একটি প্রবেশপথ রয়েছে। মন্দিরের ছাদ ও কর্ণিশ বাঁক যুক্ত।

তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির

চিত্র: ৩২ ভূমি নকশা: ৯

অবস্থান:

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা তাঁতীবন্দ গ্রামে তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোনে প্রাচীর সংলগ্ন একটি তিনতলা বিশিষ্ট মন্দির রয়েছে। স্থানীয় ভাবে এটি দোলমঞ্চ বা দোল মন্দির নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা:

বর্গাকার ভিত্তির উপর নির্মিত এই মন্দিরের পরিমাপ ৭.১০ x ৭.১০ মিটার। মন্দিরটির উচ্চতা আনুমানিক ২১ মিটার। মন্দিরের প্রথম তলায় একটি অন্তঃকক্ষ ও দুটি প্রদক্ষিণ পথ, দ্বিতীয় তলায় একটি অন্তঃকক্ষ ও একটি প্রদক্ষিণ পথ এবং তৃতীয় তলায় একটি মাত্র কক্ষ রয়েছে। প্রথম তলার প্রথম প্রদক্ষিণ পথটি প্রত্যেক দিকে পাঁচটি খিলান সহযোগে নির্মিত। এর দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথে প্রত্যেক দিকে তিনটি খিলান ও অন্তঃকক্ষে প্রত্যেক দিকে একটি করে খিলান দরজা রয়েছে। প্রথম তলার চার কোনে নির্মিত হয়েছে চারটি ছত্রী আকারের রত্ন বা শিখর। দ্বিতীয় তলাটি প্রথম তলার দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথ ও অন্তঃকক্ষের অনুরূপ। এর চারদিকেও চারটি রত্ন নির্মিত হয়েছে। তৃতীয় তলাটি প্রথম ও দ্বিতীয় তলার অন্তঃকক্ষের সমান। এই কক্ষের উপরে অষ্টকোনাকার গম্বুজ আকারে নির্মিত হয়েছে মন্দিরের সর্বশেষ রত্নটি এর শীর্ষদেশ পিতলের তৈরী। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এর শীর্ষদন্ডটি ভেঙ্গে গেলেও এখনও ভগ্ন অবস্থায় তা মন্দির শীর্ষে বর্তমান। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার মোট নয়টি রত্নের উপস্থিতির কারণে এই মন্দিরটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত।

মন্দিরের খিলান গুলো বহুখাজ বিশিষ্ট। এর মূল প্রবেশ পথটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

অলংকরণ:

তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দিরটির মূল অলংকরণ পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে দেখা যায়। এই দুই পাশের দেয়ালের খিলানের স্প্যান্ড্রিল জ্যামিতিক ও ফুল-লতা পাতার অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত। এর দ্বিতীয় তলার প্রদক্ষিণ পথের খিলানের উপরে একটি করে করজোড় ভঙ্গিতে নির্মিত আবক্ষ মুর্তির প্রতিকৃতি রয়েছে। এছাড়া মন্দিরের তৃতীয় তলায় দেয়ালের বহির্গাত্রে উম্মুক্ত খিলানের দুই ধারে এক সময় পলেস্তরা নির্মিত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে এইসব প্রতিকৃতি খসে পরেছে। তবে এর চিহ্ন দেয়ালে এখনও বর্তমান। মন্দিরের দ্বিতীয় তলার অন্ত ঃকক্ষের দেয়ালে এই ধরণের একটি মস্তক বিহীন দেব প্রতিকৃতি এখনও দৃশ্যমান। মন্দিরের গম্বুজটি একটি উল্টানো পদ্মের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের ভিত্তির চতুদিকে বাঁকানো

Dhaka University Institutional Repository

মারলন নকশা দেখা যায়। এই ধরনের গম্বুজের ব্যবহার সাধারণতঃ অষ্টকোনাকার মন্দিরেই অধিক লক্ষ্য করা যায়। ধরনা করা হয়, অষ্টদশ শতকে মুর্শিদাবাদে এই ধরনের গম্বুজের ক্রমবিকাশ ঘটে। সম্ভবতঃ মুসলিম গম্বুজ স্থাপত্যকে মন্দির স্থাপত্যের যোগ্য করে গ্রহন করতে যেয়ে গম্বুজের এই রূপ গৃহিত হয়েছে।[১৪] বর্তমানে এই নবরত্ন মন্দিরটি জীর্ণ অবস্থায় পতিত হলেও এক সময় এর জাঁক জমক মানুষ আকৃষ্ট করত তাতে সন্দেহ নাই।

নির্মাণকাল:

তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দিরটি গুরু গোবিন্দ চৌধুরী ১২৫০ বঙ্গাব্দে / ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

শিলালিপি:

মন্দিরটিতে বর্তমানে কোন শিলালিপি নাই। রাধা রমন সাহা একটি শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন। শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপঃ

১২৫০ শকাব্দ ১৭৬৫ সন বিখ্যাতোপেন্দ্র

পৌত্রেন গঙ্গা গোবিন্দ সুনুনা

নির্ম্মে গুরু গোবিন্দ শাম্মর্ণৌ পেস্নমান্দরম।[১৫]

উপরুক্ত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, মন্দিরটি উপেন্দ্রনারায়নের পৌত্র গুরু গবিন্দ কর্তৃক তার পিতা গঙ্গা গবিন্দর স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। লিপিটিতে এর নির্মাণ তারিখ দেওয়া আছে ১২৫০ শকাব্দ যা সম্ভবতঃ 'বঙ্গাব্দ' হবে কেননা ১২৫০ শকাব্দ হলে মন্দিরের নির্মাণকাল হয় ১২৫০+৭৮ = ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দ, যা এই মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী বা এর নির্মাতার সময়কাল কোনটার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লিপিতে প্রদত্ত ১৭৬৫ ইংরেজী সনটিও ভুল। প্রথমতঃ এটা ১২৫০ বঙ্গাব্দ বা শকাব্দ কোনটির সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, দ্বিতীয়তঃ জমিদার উপেন্দ্রনারায়ন অষ্টদশ শতকের শেষ বা উনবিংশশতকের প্রথমদিকে তাঁতীবন্দ জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মন্দিরের নির্মাতা গুরু গবিন্দ হলেন উক্ত উপেন্দ্রনারায়নের পৌত্র সুতরাং ১৭৬৫ ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

সনে তার পক্ষে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ১২৫০ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী তাই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল (১২৫০ + ৫৯৩) ১৮৪৩ খিষ্টাব্দ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কতৃক সংরক্ষিত ইমারত নয়।

তাঁতীবন্দ একরত্ন মন্দির

চিত্র: ৩৩

অবস্থান:

তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়ী প্রাঙ্গনে দক্ষিণ দিকে একটি এক রত্ন মন্দির দেখা যায়। এটি নবরত্ন মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত।

বর্ণনা:

এটি বর্গাকারে নির্মিত এক রত্ন বিশিষ্ট মন্দির। এর প্রথম তলাটি বর্গাকার, এর চারদিকে চারটি খিলান পথ রয়েছে। খিলান গুলো বহুখাজ বিশিষ্ট। এর দ্বিতীয় তলাটি অপেক্ষাকৃত সরু ও অষ্ট কোনাকারে নির্মিত। এর শীর্ষদেশ একটি অষ্ট কোনাকার গম্বুজ দ্বারা আছদিত। দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ দিকে একটি খিলান পথ রয়েছে। এই খিলানটিও বহু-খাঁজ বিশিষ্ট। এর অপরাপর বাহু গুলোতে বদ্ধ খিলান দেখা যায়। গম্বুজটি একটি অনুচ্চ ড্রামের উপর নির্মিত। গম্বুজ শীর্ষে একটি ত্রিশূল শীর্ষদন্ড রয়েছে। এর দ্বিতীয় তলাটি মূলতঃ মন্দিরের শিখর। একরত্ন মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যে প্রচলিত থাকলেও এর গম্বুজ নির্মাণে মুসলিম রীতির অষ্টকোনাকার ড্রামের ব্যবহার ব্যতিক্রমী।

অলংকরণ:

মন্দিরটিতে খুব বেশী অলংকরণ চোখে পরে না। শুধু মাত্র গম্বুজের অষ্টকোনাকার ড্রামের গায়ে একসারি বাঁকানো মারলন নকশা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

মন্দির গাত্রে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও মন্দিরের নির্মাণ রীতি দৃষ্টে মনে হয় এটা অন্ততঃ পক্ষে তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দিরের (১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) পূর্বে নির্মিত হয়েছে।

শিলালিপি:

মন্দিরে বর্তমানে কোন শিলালিপি নাই। তবে রাধা রমন সাহা এই মন্দিরের একটি শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন। শিলালিপিটির পাঠ নিম্নরূপঃ

১২৪৮ শকাব্দ ১৭৬৩ সন তারিখ শকেরবহ্নি

সিন্ধু ক্ষিতি পরিমিতি কার্ত্তিকে কারু বাল বোধিষ্ণু

পদাম্বজ যশ মনং দেববৃন্দে সুরাধ্যেঃ

শ্রীআরাধনেন শ্রীগোবিন্দ শর্ম্মনঃসুখনাশ বরদা নির্ম্মামে মন্দির,

গঙ্গা গোবিন্দসুন্দর দিনয়াচিত সুন্দরসুপ্রাসাদাং শ্রীমাধবঃ।[১৬]

তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দিরের শিলালিপির ন্যায় এই লিপিতেও বঙ্গাব্দের জায়গায় শকাব্দ ও ইংরেজী সনে ভুল রয়েছে। মন্দিরটি ১২৪৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২৪৮+৫৯৩ = ১৮৪১ ইংরেজী সনে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতীবন্দ শিবমন্দির

চিত্র: ৩৪

অবস্থান:

তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়ির প্রবেশ দ্বারের উভয় দিকে দুটি শিব মন্দির রয়েছে। মন্দির দুটো ভগ্নপ্রায় হলেও দক্ষিণ দিকের দোলমঞ্চ সংলগ্ন মন্দিরটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। মন্দির দুটির দূরুত্ব প্রায় ৪.৫৭ মিটার।

বর্ণনা:

মন্দির দুটি বৃর্গাকৃতির ও গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও এক। এদের ছাদগুলো চৌচালাকারে নির্মিত এবং ক্রমশঃ সরু হয়ে একটি বিন্দুতে যেয়ে মিশেছে। ছাদের কর্ণিশ প্রতিটি দিকেই ধনুকের মত বাঁকানো। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে চুন সুরকীর আস্তরণ লক্ষ্য করা যায়। এদের প্রবেশপথ একটিই পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রবেশপথ বহু-খাঁজ খিলানে নির্মিত এবং এর প্রস্থ .৯০ মিটার। মন্দিরের অভ্যন্তরে পূর্ব দিকের দেয়ালে একটি কুলঙ্গি আছে।

অলংকরণ:

মন্দির দুটির অলংকরণ খুবই সামান্য এদের পশ্চিম দেয়ালে প্যানেল নকশা ছাড়া সমগ্র মন্দিরে আর কোন অলংকরণ দেখা যায় না।

নির্মাণকাল:

উত্তর দিকে অবস্থিত মন্দিরটির বহিঃদেয়ালে প্রাপ্ত একটি লিপি থেকে এর নির্মান কাল ১২১৩ বঙ্গাব্দ/ ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানা যায়। [১৭] কথিত আছে যে, জমিদার গঙ্গাগোবিন্দ চৌধুরী ও তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ চৌধুরী হেমরাজপুর হতে দুটি শিবলিঙ্গ তাঁতীবন্দে স্থানন্তরিত করেন ও এই মন্দিরে সেগুলো স্থাপন করেন। [১৮]

শিলালিপি:

উত্তরের শিব মন্দিরের দরজার উপর বহিঃদেয়ালে একটি শিলালিপি রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.জমিদার বাড়ি

দুলাই জমিদারী

ইতিহাসঃ

পাবনা সদর থানা হতে ৩৫ কিলোমিটার পূর্বে বর্তমান সুজানগর উপজেলার অধীনে দুলাই গ্রামটি অবস্থিত। এই দুলাই গ্রামের চৌধুরী উপাধিধারী জমিদার বংশ পাবনা অঞ্চলের মুসলমান জমিদারদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রহিমুদ্দীন মুন্সী ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, রহিমুদ্দীন মুন্সির পিতার নাম ছিল শাহ্ সারওয়াদী।[১৯] তিনি দুলাইয়ের নিকটবর্তী কোন গ্রামে বাস করতেন। রহিমুদ্দীন মুন্সী ফার্সী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়ায় নাটোর রাজবাড়ীতে নকলনবিশের কাজ পান এবং সেখান হতে তার কাজের দক্ষতার জন্য মুন্সী উপাধি লাভ করেন। নিজ কর্ম দক্ষতা বলে পরবর্তীতে মুন্সী রহিমুদ্দীন রাজশাহী কালেকটিরীতে পেশকার পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় জেলা ১ম ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর পদের ইংরেজ কর্ম কর্তাগণ অধিকাংশ সময় কলকাতায় সময় কাটাতেন বলে সেরেস্তাদার ও পেশকারগণ জেলার সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতেন। এভাবে রাজশাহী কালেক্টরীর পেশকার মুন্সী রহিমুদ্দীন তার ক্ষমতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং নীলামে প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করে দুলাই জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রহিমুদ্দীন দুলাই চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁর পুত্র আজিম চৌধুরীর সময়ে দুলাই জমিদারীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জমিদারীর আয় ছাড়াও এ সময় তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ২/৩ টি নীলকুঠিতে নীলের কাজ চলত। যা থেকে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন।[২০] মুন্সি রহিমুদ্দীন ছিলেন প্রজাবৎসল ও পর ধর্ম সহিষ্ণু জমিদার। তাঁর এষ্টেট হতে রাজশাহীর স্কুল কলেজের বহু ছাত্র মাসিক আর্থিক সাহায্য পেত। তিনি তাঁর অর্থ দ্বারা দুলাই গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দুলাই জমিদারীর মোট সম্পত্তির পরিমান সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, দুলাই গ্রামে ৪০ একর জমির উপর নির্মিত তাদের প্রাসাদপম বাড়ী রয়েছে। বাড়ীটি একটি দীঘি দ্বারা বেষ্টিত। এই দীঘি বেষ্টিত এলাকায় জমিদারের বসতবাড়ী, মসজিদ ও একটি জলাশয় রয়েছে। পূর্বে জলাশয়ের দক্ষিণ পাড়ে একটি নীল কুঠি ছিল যা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই জমিদারবাড়ী হতে ৯১.৪৪ মিটার পূর্বে ছিল জমিদারের হাওয়া খানা। দুলাই গ্রামের এই সমস্ত স্থাপনা ছাড়াও পাবনা সদরে ১৫ বিঘা জমির উপর নির্মিত হয়েছিল দুলাই চৌধুরী বাড়ী। এই বাড়ীর বেষ্টনির মধ্যে একটি মসজিদ রয়েছে যা পাবনা শহরের অন্যতম মসজিদ স্থাপত্য নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়।

আজিম উদ্দীন চৌধুরীর পরবর্তী বংশধরগণের অদূরদর্শীতা ও সম্পত্তির পরিমান সম্বন্ধে যথাযথ অবগতি ও রক্ষনাবেক্ষণের অভাব দুলাই জমিদারীর অবনতির কারন । সর্বোপরি ১৯৫২ সালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের মধ্য দিয়ে দুলাই জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটে।

দুলাই জমিদারবাড়ি

চিত্র: ৩৫

অবস্থান:

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার অন্তর্গত দুলাই গ্রামে দুলাই জমিদারবাড়িটি অবস্থিত। ইউনিয়ন: দুলাই, মৌজা: দুলাই। থানা অফিস হতে বাড়ীটির দুরুত্ব ১১ কিলোমিটার পূর্ব ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে প্রায় ১.২০ কিলোমিটার। এর দক্ষিণ পূর্ব দিকে রয়েছে আত্রাই নদী। প্রধান সড়ক হতে দুলাই জমিদার বাড়িটি ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। দীঘি বেষ্টিত এই জমিদারবাড়ির মোট জমির পরিমান ৪০ একর।

বর্ণনা:

Dhaka University Institutional Repository

চারিদিকের দিঘি বেষ্টনির কেন্দ্রস্থলে এক বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়িটি স্থাপিত । বেষ্টনি প্রাচীর সহ বাড়ীটির আয়তন ১০৩.৬৩ x ৩৬.৫৭ মিটার। মূলবাড়িটির আয়তন ৮৫.৯৫ x ৩৬.৫৭ মিটার। জমিদারবাড়িটি প্রবেশের জন্য একটি রাজকীয় প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথটি মূলবাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত ও পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। এটা মূলবাড়ি হতে একটি স্বতন্ত্র ইমারত। মোট বারটি বৃহৎ স্তম্ভ সহযোগে অর্ধবৃত্তাকারে প্রবেশ পথের সম্মুখাংশ গঠিত। অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত বলে একে ঘড়ি দালানও বলা হয়ে থাকে। এই অর্ধবৃত্তাকার অংশের পিছনে চারটি খিলান শ্রেনীর মধ্যে দিয়ে বাড়ির দক্ষিণাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। খিলান শ্রেনীর দুই ধারে প্রহরীদের জন্য নির্মিত একাধিক কক্ষ রয়েছে। খিলান শ্রেনীর একই অক্ষে বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম অংশে নির্মিত হয়েছে একটি মসজিদ। প্রবেশ তোরণ, দক্ষিণ অঙ্গন ও মসজিদের উত্তর দিকে মূলবাড়িটি অবস্থিত।

মূল বাড়িটি দুটি আলাদা ইউনিটে বিভক্ত। একটি অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা মসজিদ ও অঙ্গন হতে বাসস্থান গুলোকে পৃথক করা হয়েছে। প্রথম দালানটি কাচারি ও অন্যটি অন্দর মহল। দুটি দালানই দ্বিতলাকারে নির্মিত। তবে বর্তমানে সম্পূর্ণ বাড়িটির ছাদ ধসে পড়েছে। অন্দর মহলটির একটি সিড়িঘরের চিলেকোঠা ছাড়া দোতলার আর কোন অংশ টিকে নাই। কাচারিটি দুইটি কক্ষের সম্বন্ধয়ে গঠিত এর দ্বিতীয়টি দরবার কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এর আয়তন ১৩.৪১ মিটার x ১৩.৭১ মিটার এই চারদেয়ালে ৫টি করে মোট ২০টি খিলান রয়েছে।

অন্দর মহলটির প্রথম তলা ৪টি কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। অন্দর মহলের উত্তর পূর্ব দিকে ও কাচারির উত্তর দিকে মহিলাদের স্নানের জন্য একটি হাম্মাম রয়েছে। বর্তমানে এটিও প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধবংস প্রাপ্ত। হাম্মামের মাঝখানে ছিল একটি বিশাল বৃত্তাকার জলাধার এর ব্যস ১২.৮০ মিটার। জলাধারটি পশ্চিম পার্শ্বে একটি সোপান শ্রেনী ছিল এবং এর মাঝখানে ছিল একটি স্তম্ভ। জলাধারে পানি সরবরাহের জন্য বাইরের দিঘি হতে হাম্মাম পর্যন্ত নালার ব্যবস্থা ছিল। জলাধরে হতে পানি নিস্কাশনের জন্য ও এর নিম্নাংশে আর একটি নালার ব্যবস্থা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দুলাই জমিদারবাড়িতে হাম্মামের উপস্থিতি পাবনা অঞ্চলের জমিদারবাড়ি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। দুলাই জমিদারবাড়ি ছাড়া পাবনা জেলায় অবস্থিত আর কোন জমিদারবাড়িতে এই ধরনের হাম্মাম দেখা যায় না। সাধারণতঃ জমিদারবাড়ি সংলগ্ন জলাশয় গুলোই ছিল স্নানের একমাত্র স্থান।

অলংকরণ:

দুলাই জমিদারবাড়ি অলংকরণে পলেস্তরা নকশায় ইউরোপীয় রীতির স্থাপত্য প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করেছে। নকশার বিষয়বস্তু লতানো ফুল। সাধারণ ভাবে খিলানের শীর্ষ ও এর দুই পাশ এবং তার উপরের দেয়ালে পাড়ের মত করে এই নকশাগুলো করা হয়েছে। এছাড়া দোতলার জানালাগুলোর উপরে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের অনুকরনে ত্রিকোনাকার পেডিমেন্ট লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য পলেস্তরার অলংকরণ ছাড়াও রঙের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই ইমারতে লাল ও হালকা গোলাপী রঙের খোপ নকশাও লক্ষ্য করা যায়। জমিদারবাড়ির প্রবেশ পথের উপরাংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় এর প্রবেশ তোরণে কোন অলংকরণ ছিল কিনা বোঝা যায় না তবে এই প্রবেশ তোরণটি মাটি থেকে প্রায় ৯.৫০ মিটার উচু ছিল তার প্রমান এখন দাড়িয়ে থাকা প্রবেশ তোরণের একটি দেয়াল থেকে বোঝা যায়।

নির্মাণকাল:

দুলাই জমিদারবাড়ির নির্মাণকাল সমন্ধে কোন লিপি পাওয়া যায় না। তবে জমিদারবাড়ির অঙ্গনে স্থাপিত মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে মসজিদটির নির্মাণ কাল ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ বলে জানা যায়। সম্ভবতঃ বাড়িটি ঐ একই সময় নির্মিত হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতীবন্দ জমিদারী

ইতিহাসঃ

তাঁতীবন্দ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার একটি গ্রাম। তাঁতীবন্দ জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। এরা ছিলেন বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, এদের পূর্ব উপাধি ছিল সান্যাল। চাটমোহর থানার বোঁথর গ্রাম ছিল এদের আদি নিবাস।[২১] তাঁতীবন্দ জমিদারদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন রায়বল্লভ চৌধুরী। রায়বল্লভ আত্নীয় পরিজনের অত্যাচার ও আর্থিক অনটনের কারণে বোঁথর হতে তাঁতীবন্দের নিকটবর্তী চন্ডীপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। রাধাবল্লভ চৌধুরী মুঘলদের অধীনে চাকুরী করতেন এবং এই সময় বেশ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি ও জমিদারি লাভ করেছিলেন। রাধাবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের পুত্র ছিলেন উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। তিনি বাংলা ও উর্দু ভাষায় পারদর্শীতা অর্জন করে নাটোর কালেক্টরীতে সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উপেন্দ্রনারায়ণ প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। তিনি বাইশ থানার দারোগা বলে পরিচিত ছিলেন। [২২] উনিশ শতকের প্রারম্ভে সেরেস্তাদারগণ পুলিশ বিভাগেরও সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। এ সময় নাটোর রাজের অনেক ভূসম্পত্তি নিলাম হতে আরম্ভ করলে সেই সুযোগে উপেন্দ্রনারায়ণ বহু স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে নেন। এইভাবে নাটোর কালেক্টরীতে সেরেস্তাদার পদে চাকুরী করে উপেন্দনারায়ণ প্রভুত অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করেন এবং উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে তাঁতীবন্দ জমিদারির প্রতিষ্টা করেন। তাঁর পুত্র গঙ্গা গোবিন্দ চৌধুরী ও পৌত্র গুরু গোবিন্দ চৌধুরীর সময় তাঁতীবন্দের নিকটবর্তী ভবানীপুরের নন্দী ও হেমরাজপুরের সরকার উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারগণের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের মাধ্যমে তাঁতীবন্দ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। গঙ্গা গোবিন্দ চৌধুরীর তিনপুত্র গুরু গোবিন্দ, দূর্গা গোবিন্দ ও বরদা গোবিন্দ চৌধুরীদের সময়ও তাঁতীবন্দ জমিদারীর সুনাম অক্ষুন্ন থাকে। গুরুগোবিন্দ ১২৫০ বঙ্গাব্দে তাঁতীবন্দের অনিন্দ সুন্দর দোলমঞ্চ নির্মান করেন। গুরুগোবিন্দের পুত্র বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ও পাবনার মধ্যে নিজ খরচে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রহরী মোতায়ণের প্রস্তাব দিয়ে তৎকালীন গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (১৮৫৪- ৫৮) কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলেন।[২৩] নীলকমিশানের সময় কালে বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী বিনা পাশে দুটি কামান ও বন্দুক রাখার সরকারী অনুমোদন লাভ করেন।[২৪] কথিত আছে যে, তাঁর আমন্ত্রনে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেন্ড (১৮৬৯ - ৭২) শিকার উপলক্ষে তাঁতীবন্দে এসেছিলেন।[২৫] গুরুগোবিন্দ চৌধুরীর অপরপুত্র অভয় গোবিন্দ্র চৌধুরী পাবনা শহরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালের সিলভার জুবিলী পূর্তিতে (১৮৮৭) একটি আদর্শ জলাশয় খননের জন্য ভূমি দান করেন উক্ত স্থানে খননকৃত জলাশয়টি বর্তমানে জুবিলী ট্যাঙ্ক নামে পরিচিত।

তাঁতীবন্দে এখনও এখানকার জমিদারদের নির্মিত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বাড়ি ও বেশ কিছু মন্দির নিদর্শন বিদ্যমান।

তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়ি

অবস্থান:

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার তাঁতীবন্দ গ্রামে তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়িটির অবস্থান।

বর্ণনা:

প্রায় পচিশবিঘা জমির উপর নির্মিত তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়িটি কাচারিবাড়ি ও অন্দরমহল বা ভিতরবাড়ি এই দুই ভাগে বিভক্ত। কাচারিবাড়িটি প্রাচীর বেষ্টিত একটি তিনতলা ভবন। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে মূল বাড়িটি ছাড়াও দুটি দোচালা শিব মন্দির ও দুটি দোলমঞ্চ রয়েছে। মূলবাড়ির প্রধান প্রবেশপথ পূর্ব দিকে। বাড়িটি অঙ্গন কেন্দ্রিক। ভবনের কক্ষসমূহ টানা বারান্দার পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত। কক্ষের খিলান যুক্ত প্রবেশপথগুলি অর্ধগোলাকৃতির খাজ খিলান বিশিষ্ট। অন্দরমহলটিও অঙ্গনকেন্দ্রীক তবে দ্বিতলাকারে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকরণ:

জমিদারবাড়িটির অলংকরণে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বেশীর ভাগ অলংকরণ রয়েছে বাড়িটির খিলান ও কর্ণিশের স্থাপত্যিক রেখাকে অনুসরণ করে । অলংকরণের বিষয়বস্তু হিসাবে স্ট্যাকো পদ্ধতিতে নির্মিত ফুল-লতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

নির্মাণকাল:

তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গনে নির্মিত দোলমঞ্চগুলোর নির্মাণকাল জানা গেলেও মূল জমিদার ভবনটির নির্মানকালের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একে উনবিংশশতকের প্রথম দিকের নির্মাণ বলে ধারনা করা যায়।

তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়িটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিতও নয়। তাঁতীবন্দের এই ইমারতগুলো এখনই সংরক্ষনের ব্যবস্থা না করলে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

শিতলাই জমিদারী

ইতিহাস:

শিতলাই চাটমোহর উপজেলার সমাজ গ্রামে অবস্থিত একটি পাড়া।[২৬] এটি ঈশ্বরদী ও সিরাজগঞ্জ রেলওয়ের শরৎ নগর রেলষ্টেশন হতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের জনৈক চন্ডী প্রসাদ মৈত্র রাণী ভবানীর আমলে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করে শিতলাই জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র জগন্নাথ সুপন্ডিত ছিলেন। জগন্নাথের দুইপুত্র লোক নাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র। লোকনাথ একজন আইনজীবি ছিলেন এবং আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। লোকনাথের সাথে ইংরেজ সরকারেরও সুসম্পর্ক ছিল। তিনি রাজশাহীতে

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাথ স্কুল' অবৈতনিক মাধ্যমিক ইংলিশ স্কুল ও কাশীতে রাজরাজেশ্বরী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৪ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

১৯০০ সালের দিকে শিতলাই জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র পাবনা সদর থানায় তাদের বাসস্থান নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটা শিতলাই হাউজ নামেই অধিক পরিচিত।

শিতলাই জমিদারবাড়ি বা শিতলাই হাউজ

চিত্র: ৩৬

অবস্থান:

পাবনা শহরের পূর্ব প্রান্তে পদ্মা নদীর পরিত্যক্ত খাতের উত্তর তীরে শিতলাই জমিদারদের তৈরী শিতলাই জমিদারবাড়িটি অবস্থিত। স্থানীয় ভাবে এটি শিতলাই হাউজ নামে পরিচিত।

বর্ণনা:

প্রাচীর ঘেরা বিশাল অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই ইমারতের আয়তন ৩০.৪৮ x ২৭.৪৩ মিটার। এর পূর্ব দেয়ালে রয়েছে এর মূল প্রবেশ পথ। প্রবেশপথের সামনে নির্মিত হয়েছে একটি গাড়ী বারান্দা। অর্ধগোলাকারে নির্মিত এই গাড়ী বারান্দায় করেন্থিয়ান স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবাড়িটি অঙ্গন কেন্দ্রীক ও দ্বিতলাকারে নির্মিত। গাড়ী বারান্দাটিও দ্বিতল। এর উপরে ইউরোপীয় রীতিতে নির্মিত হয়েছে একটি পেডিমেন্ট। বাড়ীটির প্রবেশদ্বার হতে একটি সোপান শ্রেনী দোতলায় উঠে গিয়ে একটি প্রশস্ত করিডর যেয়ে শেষ হয়েছে। সোপান শ্রেনীটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী। ইমারতের কক্ষগুলো এর অঙ্গনের চারিদিকে নির্মিত হয়েছে। ইমারতটিতে ছোট বড় প্রায় ২০টি কক্ষ রয়েছে। একতলা ও দোতলায় নির্মিত এই কক্ষগুলোর সামনে নির্মিত হয়েছে একটি ঘোরানো বারান্দা যা ইমারতের চার বাহুকে সংযুক্ত করে রেখেছে। এই বারান্দায় লোহার স্তম্ভের উপর খিলান লক্ষ্য করা যায়। ইমারতটির কক্ষগুলোর বাইরের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে পূর্ব দেয়ালেও একটি বারান্দা রয়েছে। এখানেও লোহার স্তম্ভের উপর এক সারি খিলান শ্রেনী লক্ষ্য করা যায়। খিলানগুলো অর্ধগোলাকারে নির্মিত এবং খিলান শীর্ষের কিষ্টোনটিও ইউরোপীয় রীতিতে বৃহৎ করে নির্মিত। ইমারতের কাঠের দরজা ও জানালাগুলো ভেনিশীয় রীতিতে তৈরি।

ইমারতের উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি অংশকে কিছুটা বর্ধিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। এই বর্ধিত অংশের দুই ধারে নির্মিত হয়েছে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন্থিয়ান স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে একটি বৃহদাকারের পেডিমেন্ট। এই দেয়ালের পশ্চিমাংশে একটি অষ্টকোনাকার বুরুজ রয়েছে। এটি ত্রিতল বিশিষ্ট। এর তৃতীয় তলাটি আটটি খিলান সহযোগে নির্মিত গম্বুজ আচ্ছাদিত একটি ছত্রী বিশেষ। ইমারতটির ছাদের চারিদিকে অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের প্রতিটি কোনে ও মাঝামাঝি স্থানে শীর্ষ দন্ড যুক্ত ক্ষুদ্রাকার পাশ্ববুরুজ নির্মিত হয়েছে।

ইমারতটি নির্মানে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় ভিলাগুলোকে অনুসরণ করা হয়েছে। এর করন্থিয়ান স্তম্ভের আধিক্য, পেডিমেন্টের ব্যবহার সর্বপরি ইমারতের এক কোণে ক্ষুদ্র গম্বুজ যুক্ত কক্ষের উপস্থিতি ইউরোপীয় প্রভাবকেই নির্দেশ করে।

নির্মাণকাল:

পাবনা সদরের, শিতলাই জমিদারবাড়িটি ১৯০০ সালের দিকে জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক নির্মিত হয়।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াশ জমিদারি

ইতিহাস:

অবিভক্ত পাবনা জেলার সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার হলেন তাড়াশের জমিদারগণ। তাদের আদি নিবাস ছিল তাড়াশের অদূরে অবস্থিত চড়িয়া গ্রামে। তাড়াশ জমিদারদের পূর্ব পুরুষ নাটোর রাজের অধীনে দেওয়ান পদে অধিষ্টিত ছিলেন। তাড়াশ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার নবাব মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ববিভাগে চাকরী করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং নবাব কর্তৃক রায় চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হন। তাড়াশের জমিদারদের মধ্যে বনওয়ারীলাল রায় ও তার পুত্র বনমালী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা পাবনা জেলার শিক্ষাবিস্তারে বহু অর্থ দান করেন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বনমালী রায় পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় অবস্থিত রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া পাবনা জেলা শহরে তাড়াশ জমিদারদের নির্মিত আর একটি ভবন রয়েছে। এটি তাড়াশ বিল্ডিং বা তাড়াশ রাজবাড়ি নামেও পরিচিত।

তাড়াশ রাজবাড়ি

চিত্র: ৩৭, ৩৮

অবস্থান:

পাবনা সদর উপজেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশে ভবনটি অবস্থিত।

বর্ণনা:

একটি রাজকীয় প্রবেশ পথ দিয়ে এই রাজবাড়ির শুরু। প্রবেশপথটি একটি উচু অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান সহযোগে গঠিত। এর দুইধারে এক জোড়া করে দুটি ডরীক স্তম্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

মূল ভবনটি একটি দ্বিতল ইমারত; এটি ভূমি নকশায় ইংরেজী E অক্ষরের মত । এর আয়তন প্রায় ৩০.৪৮ মিটার/১৮.২৮ মিটার। ভবনের মাঝখানের বর্ধিত অংশটি গাড়ি বারান্দা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই গাড়িবারান্দাটিও দ্বিতল এবং চারটি করেন্থীয় স্তম্ভ সহযোগে গঠিত। এই গাড়িবারান্দার দুইপাশে মূল ভবনের অপর বর্ধিত অংশ দুটি আয়তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। প্রত্যেক তলার স্তম্ভশীর্ষ করেন্থীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। ভবনের সবগুলো খিলানই অর্ধবৃত্তাকারে গঠিত। খিলানপট ইউরোপীয় রীতিতে রঙ্গিন কাঁচ দ্বারা আবদ্ধ।

নির্মাণকাল:

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে তাড়াশ রাজবাড়িটি উনবিংশ শতকের শেষের দিকের নির্মাণ।

এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত। বর্তমানে তাড়াশ রাজবাড়ির ভবনটি পাবনা মেডিকিল কলেজে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে।

বনওয়ারী নগর রাজবাড়ি

চিত্র: ৩৯

অবস্থান:

পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় ভবনটি অবস্থিত। এই ভবনের নির্মাতা বনওয়ারীলাল রায় এর নামানুসারে অঞ্চলটি বনওয়ারী নগর নামেও পরিচিত।

বর্ণনা:

একটি পরিখা বেষ্টিত এলাকায় রাজবাড়িটি গড়ে উঠেছে। এটি মূলতঃ কাচারিবাড়ি হিসাবে নির্মাণ করা হয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে এই ভবনের চারদিকে একটি পরিখা খনন করা হয়। পরবর্তীতে বনওয়ারী লাল কর্তৃক নির্মিত এই কাচারি বাড়িটি রাজবাড়ি নামে পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। পরিখার উপর নির্মিত একটি সেতু দিয়ে রাজবাড়িটি মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত। রাজবাড়িটি একটি বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান ও তিনটি পাকা ইমারত সহযোগে গঠিত। মূল কাচারি ভবনটি দ্বিতলাকারে নির্মিত। এর প্রথম তলার কক্ষ সমূহের সামনের টানা বারান্দায় আয়তাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত খিলান-পর্দা রয়েছে তবে দোতলার খিলান পর্দা নির্মাণে গোলায়িত স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভগুলো আয়নীক শীর্ষযুক্ত। এছাড়া দোতলার বারান্দায় অলংকৃত লোহার গ্রীলের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

রাজবাড়ি এলাকার অপর দুটি ভবন একতলা। এদের একটি নাচঘর ও অপরটি বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। নাচ ঘরের সামনে পরিখায় নামার জন্য সান বাঁধানো ঘাট রয়েছে।

নির্মাণকাল:

স্থাপত্য বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বনওয়ারী নগর রাজবাড়িটি উনবিংশ শতকের শেষভাগের নির্মান বলে মনে হয়।

বনওয়ারী নগর রাজবাড়িটি বর্তমানে ফরিদপুর উপজেলা পরিষদ অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংস্কার ও পরিবর্ধনের ফলে এই ভবনটির প্রাচীনত্ব অনেকাংশেই ক্ষুন্ন হয়েছে। ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অন্যান্য

মল্লিকচক কান্দিপাড়া জোড়বাংলা

অবস্থান:

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নে মল্লিকচক কান্দিপাড়া গ্রামে এই জোড়বাংলাটি অবস্থিত। স্থানীয় ভাবে ভবনটি জনৈক লালন শাহ মাবুদের ইবাদতখানা নামে পরিচিত।

বর্ণনা:

উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত দুটি দোচালা ঘরের সমন্বয়ে এ জোড়বাংলাটি গঠিত। বাইরে থেকে সম্পূর্ণ ইমারতের পরিমাপ ৩.৩৫ মিটার /৩.৩৫ মিটার। এর পূর্ব দিকের কক্ষটির পরিমাপ ১.৬০মিটার / ১.৭৫ মিটার এবং পশ্চিমদিকের কক্ষের পরিমাপ ১.২৫ /১.২৫ মিটার। জোড়-বাংলাটির উচ্চতা ৩.৫০ মিটার। এর পূর্ব দিকের কক্ষে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ রয়েছে এবং পূর্ব দিকের কক্ষ হতে পশ্চিম দিকের কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকের দরজা বরাবর রয়েছে আর একটি দরজা । এর ভিতরের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি আছে। জোড়বাংলার ছাদের কর্ণিশ কুড়েঘরের মত বাঁকানো। ভবনের ভিতরে ও বাইরে কোথাও কোন নকশা পরিলক্ষিত হয় না। এক সময় ভবনটির চারিদিকে অনুচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর ছিল বর্তমানে যার ভিতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

নির্মাণকাল:

ভবনটিতে নির্মাণকাল নির্দেশক কোন শিলালিপি নাই। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একে অষ্টদশ/উনবিংশ শতকের ইমারত বলে মনে হয়।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ভবনটিকে কোন কোন ঐতিহাসিক মন্দির হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। [২৯] বাংলাদেশে এ যাবত কালে যে সমস্ত জোড়বাংলা মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলি আকারের দিক দিয়ে এত ক্ষুদ্রাকৃতির নয়। উদাহরণ স্বরূপ: পাবনা জোড়বাংলা মন্দির (আয়তন ৮.৮৪ মিটার/ ৭.৯২ মিটার) ও কোটাকল জোড়বাংলা মন্দির, নড়াইল (আয়তন ৭.১০ মিটার /৭.১০ মিটার) এর কথা উল্লেখ করা যায়।

জোত কলসা বাংলাঘর

চিত্রঃ ৪০

অবস্থানঃ

পাবনা থানা সদর হতে ৬ মাইল(৯.৬০ কিলোমিটার)দক্ষিণে, মালিগাছা ইউনিয়নের জোতকলসা গ্রামে একটি দোচালা বাংলাঘর রয়েছে। এটি প্রধান সড়কের পূর্ব ধারে অবস্থিত।

বর্ণনাঃ

ইমারতটি এক বাংলা আকারে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৬৫মি. ও প্রস্থ ১.৮২মি.। ইমারতটির উচ্চতা প্রায় ৪.২৬ মিটার। এই ইমারতের দোচালার পিঠটি উটের পিঠের ন্যায় বাঁকানো। ইমারতটির পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ। ইমারতের অভ্যন্তরে দক্ষিণ দিকে একটি কুলঙ্গি রয়েছে। এর উচ্চতা .৯১ মিটার। ইমারতটি নির্মানে চুন শুরকী ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণঃ

ইমারতটিতে তেমন কোন অলংকরণ নাই। তবে এর পশ্চিমের দেয়ালটি কিছুটা ভিতরের দিকে ঠেলে নির্মাণ করে অনেকটা প্যানেলের আকৃতি দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণকাল:

ইমারতটিতে নির্মাণ কাল নির্দেশক কোন লিপি নাই স্থানীয় জনগণ একে মসজিদ বলে অভিহিত করে থাকে। সম্ভবতঃ পূর্বে এর পাশে কোন মসজিদের অবস্থান ছিল। মসজিদের পাশে ক্ষুদ্র দোচালা আকৃতির ইমামবাড়া, সমাধি বা ইবাদতখানা নির্মাণ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে খুবই জনপ্রিয় একটি বিষয় ছিল। সুতরাং স্থানীয় জনশ্রুতি ও অপরাপর উদাহরণ দেখে এই বাংলাঘরটিকে পূর্ববর্তী কোন মসজিদ সংলগ্ন ইবাদতখানা হিসাবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এটা অষ্টদশ শতকের শেষের দিকের নির্মাণ বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১.C.B. Asher, Inventory of the Key Monuments, *The Islamic Heritage of Bengal*, Paris, UNESCO, 1984, pp. 91

২. মোঃ খালেকুজ্জামান (সম্পাঃ), *বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন*, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭,পৃ. ৭১

৩. *ঐ*

৪. আয়শা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ইউ.জি.সি., ঢাকা, ২০০২, পৃ.৬১

৫. চৌধুরী মোহাম্মদ রদরুদ্দোজা, *জেলা পাবনার ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পাবনা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬১

৬. *ঐ*

৭. অনুবাদটি অধ্যাপক আয়শা বেগমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৮.মোঃ খালেকুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

৯. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৯

৯ক. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৯

১০.সাহা, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খন্ড, পৃ.৩২-৩৩, ৫ম খন্ড, পৃ. ৬৩, বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

১১. জয়নাল হোসেন, *ঠাকুর শম্ভুচাঁদ*, পাবনা, ১৯৯৭, পৃ. ৭-১৩

১২. মোঃ খালেকুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৩. আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

১৪. G. Michell (ed.), *Brick Temples of Bengal*, New Jersey, Princeton University Press, p.43

১৫. সাহা, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১২০, বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

১৬. সাহা,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০, বেগম , *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৩

১৭. খালেকৃজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

১৮. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৮-৩০, মনোয়ার হোসেন জাহেদী (সম্পা.), *কালের বলয়ে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০*, পাবনা, অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯১, পৃ. ৬

১৯. বদরুদ্দোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

২০. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৩৭- ৪০।

২১. সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১২৮

২২. *ঐ*

২৩. Sir F. Halliday, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, p.132 .Cf. রাধা রমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১-৬ খন্ড, পাবনা, প্রথম অখন্ড সংস্করণ ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০-৩৩ বাং), পৃ.২৫০

২৪. জাহেদী, *শতবর্ষ*, পৃ. ৬

২৫। *ঐ*

২৬.সাহা, *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় খন্ড, ১৩৩৩ পৃ: ১৫১

২৭. Nazimuddin Ahmed, *Buildings of the British Raj in Bangladesh*, Jahn Sandy (ed.), Dhaka, UPL., 1986, pp. 121- 23

২৮. আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯; মো. খালেকুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

২৯. বেগম, *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

পদ্মা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী স্থলভাগের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত পাবনা জেলা সীমান্ত ফাঁড়ি হিসাবে প্রাচীন কাল থেকেই সমাদৃত। সুলতানী শাসনামলেও পাবনার ভৌগলিক অবস্থান সামরিক ও বানিজ্যিক দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১] মুঘল শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে এটা ছিল মুঘল সামাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চল। অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশশতকে গুরুত্বপূর্ণ জমিদারির অংশ থাকায় ও কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রানকেন্দ্র হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসনামলেও পাবনা অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। পাবনা জেলার স্থাপত্যিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের স্থাপত্য চিন্তার বিবর্তন নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রাচীনত্বের বিভিন্ন নিদর্শণ প্রাপ্তি সত্ত্বেও বর্তমান পাবনা জেলায় ষষ্ঠদশ শতকের পূর্বের কোন ইমারত টিকে নাই। পাবনা জেলার সর্বপ্রাচীন ইমারত হল সমাজ শাহী মসজিদ। এটি ১৫৫২ খ্রি. ইসলাম শাহ শূরের শাসনামলে নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে শূর শাসনামলে প্রাপ্ত শিলালিপির সংখ্যা খুব কম। শের শাহ্ শূরের শাসনামলে যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়েছে তাদের সবই কামানের গায়ে খোদিত লিপি।[২] এছাড়া শের শাহ্ শূরের বংশধরদের শাসনামলেরও কোন শিলালিপি বাংলায় এই পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। পাবনার চাটমোহর উপজেলার সমাজ গ্রাম অবস্থিত এই মসজিদে যে শিলালিপিটি পাওয়া যায় তাতে শের শাহ্ শূর ও তাঁর পুত্র ইসলাম (সলিম) শাহের নাম পাওয়া যায়। মসজিদটির নির্মাণ তারিখ ৯৫৮ হিজরী (১৫৫২ খ্রি.) উল্লেখ রয়েছে।[৩] এতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই শিলালিপিটিই বাংলায় শূর আমলে প্রাপ্ত একমাত্র শিলালিপি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শের শাহ্ শূর গৌড় জয়ের পর সাতগাঁও ও চট্টগ্রাম অধিকার করলেও ব্রক্ষ্মপুত্র ও সুরমার মধ্যবর্তী অঞ্চল কখনওই অধিকার করতে পারেন নাই।[৪] পরবর্তীকালে চট্টগ্রামও তাঁর অধিকার চ্যুত হয়ে যায়। সম্ববতঃ ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

শাহের সময় পাবনা অঞ্চল শূর সাম্রাজ্যের প্রায় সীমান্তে অবস্থিত ছিল। সমাজ গ্রামও ভৌগলিক অবস্থানের কারণে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব বহন করত। মসজিদটি ছাড়াও এখানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন জলাশয় ও যত্রতত্র পুরাতন ইটের উপস্থিতি সমাজ গ্রামের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

শূর বংশের পতনের পর ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘলদের নিকট দাউদ খান কররানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সম্রাট আকবরের ভাই মীর্জা হাকিমের পালক মাতার পুত্র মাসুম খান কাবুলী চাটমোহর অঞ্চলে জায়গির লাভ করেন ।[৫] এ সময় সম্রাট আকবরের সাথে তুরবতী আফগানদের বিরোধের সূত্র ধরে মাসুম খান এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। বর্তমানে চাটমোহরে মাসুম খান নির্মিত সীমান্ত ফাঁড়ির ধ্বংসাবশেষ ও একটি মসজিদ রয়েছে। সম্ভবতঃ মাসুম খান কাবুলী এই অঞ্চলে জায়গির লাভের পর এই সীমান্ত ফাঁড়িটি নির্মাণ করেন। সীমান্ত ফাঁড়ির যে তিনটি প্রহরা বুরুজের নিদর্শণ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে প্রচলিত মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ গম্বুজ নির্মাণে ড্রাম ও মারলনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত চাটমোহর শাহী মসজিদটি বাংলায় এ যাবত প্রাপ্ত প্রথম তিন গম্বুজ মসজিদ। পরবর্তীকালে এ ধরনের এক আইল ও তিন বে পরিকল্পনা বাংলার মুঘল ও মুঘল পরবর্তী স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে, যদিও এই ধরনের মসজিদ পরিকল্পনা পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক হতেই দিল্লী অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। পূর্ব ভারতে এই পরিকল্পনার মসজিদ প্রথম দেখা যায় বিহারের রোটাসগড়ে শূর আমলে নির্মিত জামি মসজিদ (১৫৪৩ সাল) ও হাবস খানের মসজিদে (১৫৭৮ সাল)। রোটাসগড় ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলার আফগান শাসকদের হেডকোয়াটার হিসাবে ব্যবহৃত হত ।[৬] বাংলায় এই পরিকল্পনার সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে নির্মিত মসজিদ হল বগুড়ার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২ সাল) । এখানে উল্লেখ্য যে, চাটমোহর মসজিদের নির্মাতা মাসুম খান কাবুলী ও খেরুয়া মসজিদের নির্মাতা মুরাদ খান উভয়ই বাংলায় আগমনের পূর্বে বিহারে অবস্থান করছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা বাংলার বিদ্রোহী আফগানদের সাথে যোগ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি পরিকল্পনার মত এ মসজিদে সুলতানী ধারার পোড়ামাটির অলংকরণও সে ভাবে অনুসৃত হয়নি বরং তার পরিবর্তে মুঘল ধারার প্যানেল নকশার আধিক্যই এখানে লক্ষনীয়। তবে গম্বুজ নির্মাণে ড্রামের অনুপস্থিতি , বক্র কর্ণিশ ইত্যাদি প্রচলিত মুঘল স্থাপত্যধারার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ যা মাসুম খানের সাথে মুঘল রাজন্যবর্গের বিরোধের পরিচয় বাহক। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করলে চাটমোহরের শাহী মসজিদকে সুলতানী ও মুঘল স্থাপত্যের সেতুবন্ধন রচনাকারী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

এর পর চাটমোহর এলাকায় আর কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্থায়ী ভিত্তিতে কোন মুঘল প্রশাসক এরপর এখানে অবস্থান করেন নাই। পাবনা জেলায় ষষ্ঠদশ শতকের পরে মসজিদ নির্মাণে দীর্ঘ শূণ্যতা রয়ে গেছে। প্রায় সম্পূর্ণ সপ্তদশশতকে পাবনা জেলায় মসজিদের নির্মাণের কোন নিদর্শণ পাওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতকের শেষ দিক হতে অষ্টদশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে পাবনায় দুটি মসজিদের নিদর্শণ পাওয়া যায়। এদের একটি সপ্তদশ শতকের শেষে নির্মিত আটঘরিয়া উপজেলার বেরোয়ান মসজিদ ও পাবনা সদর উপজেলার ভাড়ারা মসজিদ (১৭৬২ খ্রি.)। উভয় মসজিদই এক আইল ও তিন গম্বুজ পরিকল্পনায় নির্মিত। বেরোয়ান মসজিদের শীর্ষদন্ড নির্মাণে কলসের পরিবর্তে খাঁজকাটা অমলক ধরনের মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাড়ারা মসজিদটি বহু সংস্কারের ফলে আদিরূপ হারালেও পার্শ্ব বুরুজ নির্মাণে ও ছাদের অনুচ্চ বেষ্টনি প্রাচীরে মারলন নকশায় অষ্টদশ শতকের নির্মাণ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। মসজিটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর প্রবেশ তোরণে দোচালার ব্যবহার। বাংলার স্থাপত্যে চালা ঘরের প্রভাব সুলতানী আমল থেকে লক্ষ্য করা গেলেও দো-চালা কুড়েঘরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে মুঘলগণ প্রথম নিজেদের স্থাপত্যশৈলীতে সংযোজন করেন। তবে বাংলার স্থাপত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে এই নিদর্শণের উদাহরণ পাওয়া যায় না। বাংলায় মুঘল শাসনের প্রথম থেকেই প্রবেশ তোরণ, সমাধি ইত্যাদি নির্মাণে দো-চালার ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। সপ্তদশ শতক থেকে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে মসজিদের পাশে অথবা নির্জন স্থানে ক্ষুদ্রাকৃতির দো-চালাঘর নির্মাণের বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। এই দো-চালাগুলো স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে কারবালা, ইমামবাড়া, ইবাদতখানা ইত্যাদি নামে পরিচিত। পাবনা সদর উপজেলার মালিগাছা দো-চালা ঘর ও চাটমোহর উপজেলার জোড়-বাংলা এই ধরনের ইবাদত খানার উদাহরণ। মালিগাছার ক্ষুদ্র দো-চালাটি স্থানীয় ভাবে মসজিদ নামে পরিচিত। এই অতি ক্ষুদ্র পরিসরে নির্মিত দো-চালা ঘরটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহারের একেবারেই উপযুক্ত নয়। সম্ভবতঃ পূর্বে এর পাশে কোন মসজিদের অস্তিত্ব ছিল যার অংশ হিসাবে এখনও এটি মসজিদ নামেই স্থানীয় জনগনের কাছে পরিচিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের আধিপত্য বৃদ্ধি ও তাদের গৃহিত বিভিন্ন নীতির ফলশ্রুতিতে বড় বড় জমিদারিগুলো ভেঙে নতুন নতুন জমিদারির সৃষ্টি হয়। এই সকল নব্য জমিদারগণ কতৃক অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেশ কিছু ইমারত নির্মিত হয়। পাবনা জেলায় এই ধরনের মুসলিম জমিদারির সংখ্যা খুব কম। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে পাবনায় নির্মিত দুটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি ১৮০২ সালে নির্মিত দুলাই চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ অপরটি ১৮০৯ সালে নির্মিত সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ।

436780

পাবনা জেলায় মুঘল ও উপনিবেশিক আমলের যে কয়টি মসজিদ পাওয়া যায় তাদের সবগুলো তিন-গম্বুজ বিশিষ্ট ও গম্বুজগুলো প্রায় সমআকৃতির। মুঘল আমলে যে তিন-গম্বুজ পরিকল্পনা উত্তর ভারতে বিকশিত হয় তাতে মাঝখানের গম্বুজকে বড় ও উচু করে নির্মাণ করা হত। বিশেষ করে অষ্টদশ -উনবিংশ শতকে নির্মিত ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের মসজিদগুলোতে এই রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। তিন গম্বুজ পরিকল্পনার মসজিদে সকল গম্বুজকে সমভাবে নির্মাণের চর্চাটি ঢাকার বাইরেই বেশী হয়েছে বলেই মনে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার সুলতানী স্থাপত্যে বহু গম্বুজ মসজিদ নির্মাণে (১+৩ ছাড়া) সকল গম্বুজগুলো সমব্যসে নির্মাণ করা হত। তাই দেখা যায় যে, মুঘল শাসনামলে বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যরীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করলেও সমব্যসের গম্বুজ নির্মানের মত কিছু কিছু সুলতানী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রভাব উপনিবেশিক শাসনামল পর্যন্ত রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী, আগ্রা এমনকি প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে যে ধরনের স্থাপত্য বৈচিত্র ও প্রাচুয্য লক্ষ্য করা যায় রাজধানী ঢাকা সহ সমগ্র বাংলায় সেই স্থাপত্যিক জাঁকজমক অনুপস্থিত। মসজিদ ছাড়াও মুঘল আমলে যে সমস্ত স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল তাদের মধ্যে দূর্গ- প্রাসাদ, সরাইখানা, সমাধি, হাম্মাম, সেতু ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলায় মুঘল আমলে চাটমোহর মসজিদ ও সীমান্তফাঁড়ি এবং পাবনা সদরের ভাড়ারা মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থাপত্য টিকে নাই, এমনকি ছিল বলেও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। উপনিবেশিক শাসনামলে নির্মিত পাবনা জেলার মসজিদগুলো সাদামাটা ভাবেই নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও এই সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোতে উপনিবেশিক স্থাপত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাবনার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় হান্ডিয়ালের জগন্নাথের মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন। সরল ধার যুক্ত পিরামিডাকারের রেখা বৈশিষ্ট্যের এই মন্দিরটিকে ম্যাক্কাচিয়ন বিরল বৈশিষ্ট্যের বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে এই ধরনের রেখারীতির মন্দির কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিকাশ লাভ করেনি।[৭] পাবনা জেলায় হান্ডিয়ালের এই মন্দিরটি ছাড়াও চাটমোহরের বোথঁর শিব মন্দিরে একই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রেখারীতির মন্দির স্থাপত্য মূলতঃ সপ্তম/ অষ্টম শতকে মধ্যভারতে বিকশিত হয় ও পরে দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, গুজরাট, কুলু উপত্যকা ও উড়িষ্যায় প্রসার লাভ করে।[৮] বর্ধমানের বরাকরের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির বাংলায় এই রীতির মন্দিরের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হান্ডিয়ালের জগন্নাথের মন্দিরকে (পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক) বাংলাদেশে রেখা রীতির সর্বপ্রাচীন মন্দির হিসাবে ধরা যায়। তবে বরাকরের মন্দিরটি উড়িষীয় রীতিতে শীর্ষের দিকে বক্রাকারে নির্মিত কিন্তু পাবনার জগন্নাথ ও বোথঁর শিব মন্দিরের সরল ধারযুক্ত পিরামিডাকার রীতিটি বর্ধমানের আমদপুরের গোপাল মন্দির (১৫৭২ খ্রি.), ও মুর্শিদাবাদের কিরিতেশ্বরী মন্দির (১৪৬৫-৬৬ খ্রি.) ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। সরল ধার যুক্ত রেখারীতির চালা নির্মাণ পাবনা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাড়াশের কপিলেশ্বর (১৬৩৫) মন্দির দুটি ও বগুড়ার যোগীর ভবনের কালী

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরের পিরামিডাকার রেখারীতির চাল নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পাবনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই রীতির জনপ্রিয়তা এই অঞ্চলে সরল ধারের রেখারীতির ক্রমবিকাশের দিক নির্দেশ করে।

রেখা রীতি ছাড়াও পাবনা জেলায় বাংলা, চালা, রত্ন ও শিখর রীতির বেশ কিছু মন্দির রয়েছে। পাবনার বাংলা মন্দির সমূহ একবাংলা ও জোড়বাংলা এই দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম বাংলার তুলনায় বাংলাদেশে বাংলা রীতির মন্দিরের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের পাবনা, ফরিদপুর, খুলনা ও যশোর জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাংলা মন্দির রয়েছে।

পাবনা জেলার একমাত্র একবাংলা মন্দিরটি চাটমোহরের হান্ডিয়ালে অবস্থিত। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত শেঠের বাংলা নামে পরিচিত এই মন্দিরের পোড়ামাটির জাঁকালো অলংকরণ সমগ্র বাংলায় একে একটি বিশেষত্ব দান করেছে। মন্দিরের সম্মুখ দেয়াল ছাড়াও এর কাঠের দরজাটিও ছিল অপূর্ব খোদাই নকশায় অলংকৃত। দরজার ওপরের দিকে মুখোমুখি ছুটন্ত ও পদ্মকলি ভক্ষণরত ঘোড়ার যে অলংকরণ দেখা যায়, এই ধরনের অলংকরণ যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের অষ্টদশ শতকের স্থানীয় কারুশিল্পীদের নিজস্ব শিল্প প্রকাশ বলে ধারনা করা হয়।[৯] শেঠের বাংলার অনতিদূরে অবস্থিত জগন্নাথের মন্দিরের প্রবেশপথের দুইপাশে একই অলংকরণের উপস্থিতি থেকে এই বিশিষ্ট শিল্পউপাদানটি যে পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক থেকেই পাবনা অঞ্চলে চর্চিত হয়েছে তার প্রমান মেলে। এই একই অলংকরণের পুনরাবৃত্তি হান্ডিয়ালের পার্শ্ববর্তি থানা তাড়াশের (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা) কপিলেশ্বর মন্দিরেও (১৬৩৫ খ্রি.)লক্ষ্য করা যায় । তবে শিল্পগুণ বিচারে জগন্নাথের মন্দিরের ছুটন্ত ঘোড়ার অলংকরণটি অনেক উন্নত মানের এবং এর প্রকাশ ভঙ্গিও অত্যন্ত সহজ। সেই তুলনায় শেঠের বাংলার অলংকরণে আলংকারিক বাহুল্য লক্ষ্যনীয়।

বাংলাদেশে একবাংলা মন্দিরের তুলনায় জোড়বাংলা অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তর যশোর জেলায় জোড়বাংলা মন্দিরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এছাড়া ফরিদপুর ও পাবনা জেলায়ও জোড়বাংলা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। যশোরের সর্বপ্রাচীন জোড়বাংলা মন্দিরগুলো সপ্তদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল তবে এদের একটিও টিকে নাই। বর্তমানে টিকে থাকা

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরগুলো অষ্টদশ শতকের আগের নয়। সেই দিক দিয়ে পাবনার জোড় বাংলা মন্দিরটি বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন জোড়বাংলা মন্দির। অলংকরণের দিক দিয়েও এটা যশোরের মন্দিরগুলো হতে ভিন্ন ও শিল্পগুণ বিচারে শ্রেষ্ঠ। যশোরের অষ্টদশশতকের মন্দিরগুলোতে সম্মুখ দেয়ালের খিলানের চারপাশ অলংকরণে বৃহদাকার ও মুখোমুখি অবস্থানে মানুষ বা ছুঠন্ত ঘোড়ার দৃশ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল কিন্তু পাবনার জোড়বাংলা মন্দিরে মহাকাব্যিক দৃশ্যের সুনিপুণ উপস্থাপন অধিক নান্দনিক ও চিত্তাকর্ষক। এছাড়া এই মন্দিরের চালার বক্রতা যশোর ও মুর্শিদাবাদের মন্দিরগুলো হতে কম যা এক কথায় চিরায়ত লোকজ বাংলাঘরের সরল উপস্থাপন। চালা ধরনের মন্দিরের মধ্যে পাবনায় শুধুমাত্র চার-চালা মন্দিরের কিছু উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চার-চালা মন্দিরগুলোর মধ্যে চাটমোহরের বিশ্বাসবাড়ি মন্দির ও বৈদ্যনাথের মন্দির, সুজানগরের হেমরাজপুর শিব মন্দির ও তাঁতীবন্দের শিব মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যায়।

রত্ন ধরনের মন্দিরের মধ্যে পাবনা জেলায় এক-রত্ন, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন এই তিন ধরনের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাবনার একটি মাত্র একরত্ন মন্দির তাঁতীবন্দে অবস্থিত। তাঁতীবন্দের মন্দিরটি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত । এর প্রথমতলার প্রবেশপথ নির্মাণে কুলঙ্গির ব্যবহার মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রভাব।

পাবনা জেলায় পঞ্চরত্ন মন্দিরও একটি, যেটা পয়দা গ্রামে অবস্থিত। পঞ্চরত্ন মন্দির উনবিংশ শতকের একটি জনপ্রিয় রীতি হলেও এই ধরনের মন্দির স্থাপত্য চর্চা বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেই অধিক লক্ষ্য করা যায়।[১০] পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণের মূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এর রত্ন নির্মাণে। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের রত্নগুলো ক্ষুদ্রাকার রেখা দেউলাকারে তৈরী অন্যদিকে বাংলাদেশের মন্দিরগুলোতে রত্ন নির্মাণে ক্ষুদ্রাকার চালা মন্দিরের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলোর মধ্যে গোপালগঞ্জ (দিনাজপুর), নলডাঙ্গা (ঝিনাইদহ), পুটিয়া (রাজশাহী), মহম্মদপুর (মাগুড়া) ও পয়দার (পাবনা) মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলায় প্রাপ্ত নবরত্ন মন্দিরের সংখ্যাও একটি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত অপরাপর নবরত্ন মন্দির (কান্তজীউর মন্দির দিনাজপুর, সোনাবাড়িয়া নবরত্ন মন্দির ও অন্নপূর্ণা মন্দির সাতক্ষীরা ইত্যাদি) নির্মাণে রেখা দেউল ধরনের রত্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও পাবনার তাঁতীবন্দে অবস্থিত নবরত্ন মন্দিরের রত্ন নির্মাণে অষ্টকোনাকার গম্বুজের ব্যবহার নিঃসন্দেহে মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত গম্বুজের হিন্দু মন্দিরের ব্যবহার উপযোগী পরিবর্তিত রূপ। সরল কর্ণিশের উপর এই ধরনের অষ্টকোনাকার গম্বুজের ব্যবহার প্রথম অষ্টাদশশতকে মুর্শিদাবাদে বিকশিত হয়।[১১]

পাবনা জেলায় দুটি শিখর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের একটি সাথিয়া উপজেলার তলট গ্রামের গনেশ মন্দির অপরটি ফরিদপুর উপজেলার চিথুলিয়া গ্রামের শম্ভু চাঁদ আশ্রম। তলটের গনেশ মন্দিরটি সুক্ষ চুড়া বিশিষ্ট। এই ধরনের মন্দিরের চর্চা বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় এবং পদ্মা নদীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই এই রীতির মন্দিরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।[১২] অপর দিকে চিথুলিয়া গ্রামের শম্ভু চাঁদ আশ্রমে প্রচলিত কোন স্থাপত্যধারা অনুসৃত হয়নি। শৈল্পিক গুণ বিচারে মন্দির স্থাপত্যের অবক্ষয়ের ধারা এখানে প্রকট ভাবে দৃশ্যমান। অলংকরণে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রংপুরের ডিমলা কালী মন্দিরের সাথে এর স্থাপত্যগত কিছু সাদৃশ্য চোখে পরে।

১৬৯০ সালে জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতার পত্তনের পর নদীর কূল ঘেসে দূর্গ, গির্জা, আদালত ও উদ্দ্যান শোভিত ঘরবাড়ির সম্মন্বয়ে এই স্থানে গড়ে উঠে একটি বানিজ্য কেন্দ্র। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় দেওয়ানী স্থানান্তরের কিছু দিনের মধ্যে কলকাতা বৃটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়। মূলতঃ এর পর থেকে কলকাতায় যে সমস্ত ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছে সেগুলোই বাংলার পরবর্তী স্থাপত্য ধারাকে নিয়ন্ত্রন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হতে বিংশ শতক পর্যন্ত পাবনা অঞ্চলে যে সমস্ত জমিদার বাড়ি নির্মিত হয়েছে এদের সবগুলোতে বৃটিশ স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ সময় বাংলায় ইংল্যান্ডের পল্লীভবনগুলোর অনুকরনে ঘরবাড়ি নির্মিত হলেও ভারতীয় পরিবেশের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বারান্দার পিছনে কক্ষ বিন্যাস, বড় বড় জানালা, ভবন সংলগ্ন জলাশয় ও প্রার্থনা গৃহ নির্মানের মধ্য দিয়ে। পাবনায় টিকে থাকা জমিদার বাড়িগুলোর মধ্যে দুলাই জমিদার বাড়ি ও তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়ি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। দুলাই জমিদার বাড়িতে দুইপাশে কক্ষ রেখে হলঘর নির্মাণের কৌশলটি ইউরোপীয়। এছাড়া স্থাপত্যিক রেখা ধরে অলংকরণ ও জানালার ওপরে ত্রিকোনাকার পেডিমেন্টের ব্যবহার নব্যধ্রুপদি স্থাপত্যের প্রভাব। তবে দরজা ও অন্যান্য স্থানে খাঁজ খিলানের ব্যবহারে মুঘল রীতি অনুসৃত হয়েছে। পরিকল্পনার দিক দিয়ে তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়িটি অঙ্গন কেন্দ্রীক। অষ্টাদশ শতকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু বণিকগণ এই ধরনের অঙ্গন কেন্দ্রীক বাড়ি নির্মাণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত কলকাতার চোরবাগান মিত্রবাড়ি, হাটখোলার দত্ত বাড়ি ও পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক বাড়ির নাম করা যায়। পরবর্তিতে সমগ্র বাংলায় জমিদার বাড়ি নির্মাণে অঙ্গন কেন্দ্রীক পরিকল্পনাটি অনুসৃত হয়। দুলাই জমিদার বাড়ির মত তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়িতেও অলংকরণে ও কক্ষ বিন্যাসে নব্যধ্রুপদি রীতি অনুসৃত হয়েছে তবে খিলান নির্মাণে মুঘলরীতির খাঁজ কাটা খিলানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

পাবনা সদর উপজেলার তাড়াশ রাজবাড়ি ও ফরিদপুর উপজেলার বনওয়ারী নগর রাজবাড়ি দুটি উনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং শিতলাই জমিদার বাড়িটি বিংশ শতকে (১৯০০ সাল) নির্মিত। এই সমস্ত জমিদার বাড়ি নির্মাণে মুঘল বৈশিষ্ট্যের অপসরণ ও নব্যধ্রুপদি বৈশিষ্ট্য প্রকটাকারে পরিলক্ষিত হয়। খিলানগুলো এখানে খাঁজকাটা নয় বরং ইউরোপীয় কায়দায় অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত এবং এর খিলান শীর্ষের কিষ্টোনটিও ধ্রুপদি রীতিতে বড় করে নির্মিত। করেন্থিয় শীর্ষযুক্ত ও স্তম্ভ, গাড়ি বারান্দা, জানালায় ভেনিশীয় খড়খড়ি ও রঙিন কাঁচের ব্যবহার ইত্যাদি সহ সামগ্রিক আদলে এ সময়ে নির্মিত জমিদার বাড়িগুলো মূলতঃ নব্যধ্রুপদি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ইউরোপীয় পল্লীভবনগুলোর অনুকরনেই নির্মিত যা বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অবক্ষয়কে বিধৃত করে। এ সময় বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও একই ধরনের জমিদার বাড়ির নিদর্শণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মানিকগঞ্জের বালিয়াটি প্রাসাদ, জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি, রাজশাহীর পুটিয়া রাজবাড়ি, নাটর গণভবন,

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা প্রাসাদ, ও সোনারগাঁর পানাম নগরীর বাড়ি সমুহের কথা উল্লেখ করা যায়।

পাবনাসহ বাংলার অন্যান্য স্থানে উপনিবেশিক শাসনামলে যে সমস্ত জমিদারবাড়ি গড়ে উঠেছে তাদের স্থাপত্যশৈলীতে নব্যধ্রুপদি স্থাপত্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেলেও বাংলার আবহাওয়া ও এখানকার মানুষের জীবনযাপন প্রনালীর সাথে খাপ খাওয়াতে যেয়ে এখানকার ভবনগুলোতে বড় বড় জানালা, ঘরের সামনে টানা বারান্দা, ভবন সংলগ্ন জলাশয় ও ধর্মীয় স্থাপত্যের উপস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এই ভবনগুলো বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারন করেছে যা ইউরোপীয় পল্লী ভবনগুলোতে অনুপস্থিত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উপনিবেশিক আমলে বাংলায় নির্মিত জমিদরিবাড়িগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারি।

উপরোক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাবনায় মুঘল ও উপনিবেশিক শাসনামলে যে সকল ধর্মীয় ও ঐহ্যিক স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে তা সংখ্যার দিক দিয়ে কম হলেও বাংলার স্থাপত্য ক্রমবিকাশের ইতিহাস পূণর্গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উৎস ও অঞ্চল হতে প্রাপ্ত এই সমস্ত তথ্য বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। পাবনা জেলায় প্রাপ্ত স্থাপত্যসমুহে শুধু গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়েছে তা নয় বরং এখানকার স্থাপত্যসমূহ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, ASB, 1992, p.127

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩-৮৭

৩. রাধা রমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*,পাবনা, ১৩৩০বাং, পৃ. ৫২-৫৪

৪. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস ,সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭৮

৫.আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাসঃ মুঘল আমল*, প্রথম খন্ড, রাজশাহী, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২,পৃ. ৪৯

৬. C.B. Asher, The Mughal and post-Mughal Periods, *Islamic Heritage of Bengal*, Paris, Unesco, 1984, p. 195

৭. David J. McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal*, Calcutta, The Asiatic Society , 1972, p. 25

৮. *Ibid*, p. 3

৯. George Michell, *Brick Temples of Bengal*, New Jersey, Princeton University Press, 1983, p. 111

১০. McCutchion, o*p.cit.*, p. 44

১১. Michell, *op.cit.*, p. 43

১২. Perween Hasan, Art and Architecture, *History of Bangladesh 1704-1971*, Dhaka, ASB, 1997 (2nd edition), p.549

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

আইল (aisle) - দুই সারি স্তম্ভ দ্বারা পৃথক করা মধ্যবর্তী অংশ বা পথ।

আর্চ (arch) - খিলান, কোন উন্মুক্ত স্থানকে পার্শ্ববর্তী দুটি স্তম্ভ বা দেয়ালের সাথে সংযোগ সাধনের উদ্দ্যেশ্যে উন্মুক্ত স্থানের উপর বক্রাকার বা এরূপ কোন আকারের স্থাপত্য কৌশল এমনভাবে নির্মিত হয় যে তার উপরস্থ চাপ কর্ণের রেখায় নিচের দেয়ালে বা স্তম্ভের উপর পড়ে। সাধারণত দরজা ও জানালার উপর নির্মিত এইরূপ স্থাপত্য অঙ্গকে খিলান বলে।

ইনসক্রিপশন (inscription) - শিলালিখন

এনগেজড কলাম (engaged column) -সংলগ্ন-স্তম্ভ

এপেক্স (apex) - শীর্ষ, চূড়া

এক্সিস (axis) - অক্ষ

কনস্ট্রাকশন (construction) - গঠণ, নির্মাণ

কার্ভেলিনিয়ার (curvilinear) - বাঁকানো ছাদ, বক্র ছাদ

Dhaka University Institutional Repository

করবেল পদ্ধতি (corbel system) - ক্রমপূরণ পদ্ধতি

কলাম (column) - স্তম্ভ

কনকেভ (concave) - অবতল

কনভেক্স (convex) - উত্তল

কিউপলা (cupola) - ক্ষুদ্র গম্বুজ

কিয়স্ক (Kiosk) - ছত্রী

কর্ণিশ (cornice) - কার্ণিশ

কোর্ট (court) - অঙ্গন, প্রাঙ্গণ

ক্রাউন (crown) - খিলান শীর্ষ

কার্ভিং(carving) - খোদাই কাজ

ক্যাপিটাল (capital) - স্তম্ভ শীর্ষ

ক্যাস্প (cusp) - খাঁজ

টেরাকোটা (terracotta) - পোড়ামাটির চিত্র ফলক

ট্রান্সভার্স (transverse) - আড়াআড়ি

টাওয়ার (tower) - বুরুজ, মিনার , স্তম্ভ

টিম্পেনাম (tympanum) - খিলান-পটহ

ড্রাম (drum) - স্কন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ডোম (dome) -গম্বুজ, কোন কক্ষ বা ইমারতের উপর নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার বা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ছাদকে গম্বুজ বলে।

নিশ (niche) - কুলঙ্গি

পেনডেনটিভ (pendentive) - পানদানতিভ, বর্গাকার কাঠামোর উপর বৃত্তাকার গম্বুজকে ধরে রাখার জন্য বর্গের কোণগুলোতে নির্মিত ত্রিকোণাকার স্থাপত্যিক সংগঠন।

পোর্টিকো(portico) - তোরণ, অলিন্দ

প্যানেল (panel) - দেয়াল গাত্র বা দরজা গাত্রের আয়তাকার বা বর্গাকার অংশ বা বিভাজন বিশেষ।

ফাসাদ (façade) - ইমারতের সম্মুখ ভাগ

ফিনিয়াল (finial) - ক্রমহ্রাসমান সূচালো বুরুজের বা গম্বুজের শিরভাগ

বেস্টিয়ন (bastion) - (দূর্গের) বুরুজ

বাট্রেস (buttress) - দেয়ালের সংলগ্ন ঠেস স্তম্ভ

ব্রাকেট (bracket) - বন্ধনী

বে (bay) - খিলান পথ, ছাদ অথবা মেঝের ভাগ

ব্যাসাল্ট (basalt) - কষ্টিপাথর

মিনার (minar) - মসজিদ-সংলগ্ন বা মসজিদের বাইরে নির্মিত উচুঁ বুরুজ

Dhaka University Institutional Repository

মিম্বার(minber) - বক্তৃতা মঞ্চ, ইমাম যার উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করেন

মিহরাব (mihrab) - মসজিদের কিবলা প্রাচীরে কিবলা নির্দেশক স্থাপত্য প্রতীক

মোটিফ (motif) - নকশার মূল বিষয়

মোল্ডিং (moulding) - ছাঁচ

রোজেট (rosette) - চক্রাকার ফুলের নকশা

স্কুইঞ্চ (squinch) - গম্বুজ নির্মানের ক্ষেত্রে বর্গ থেকে বৃত্তে পৌছাবার লক্ষ্যে বর্গের কোনায় নির্মিত খিলান ভিত্তিক স্থাপত্যিক গঠন

স্ট্যাকো (stucco) - পলেস্তরা

স্প্যানড্রিল (spandrel) - খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র: ১

বাংলাদেশের মানচিত্রে পাবনা জেলার অবস্থান

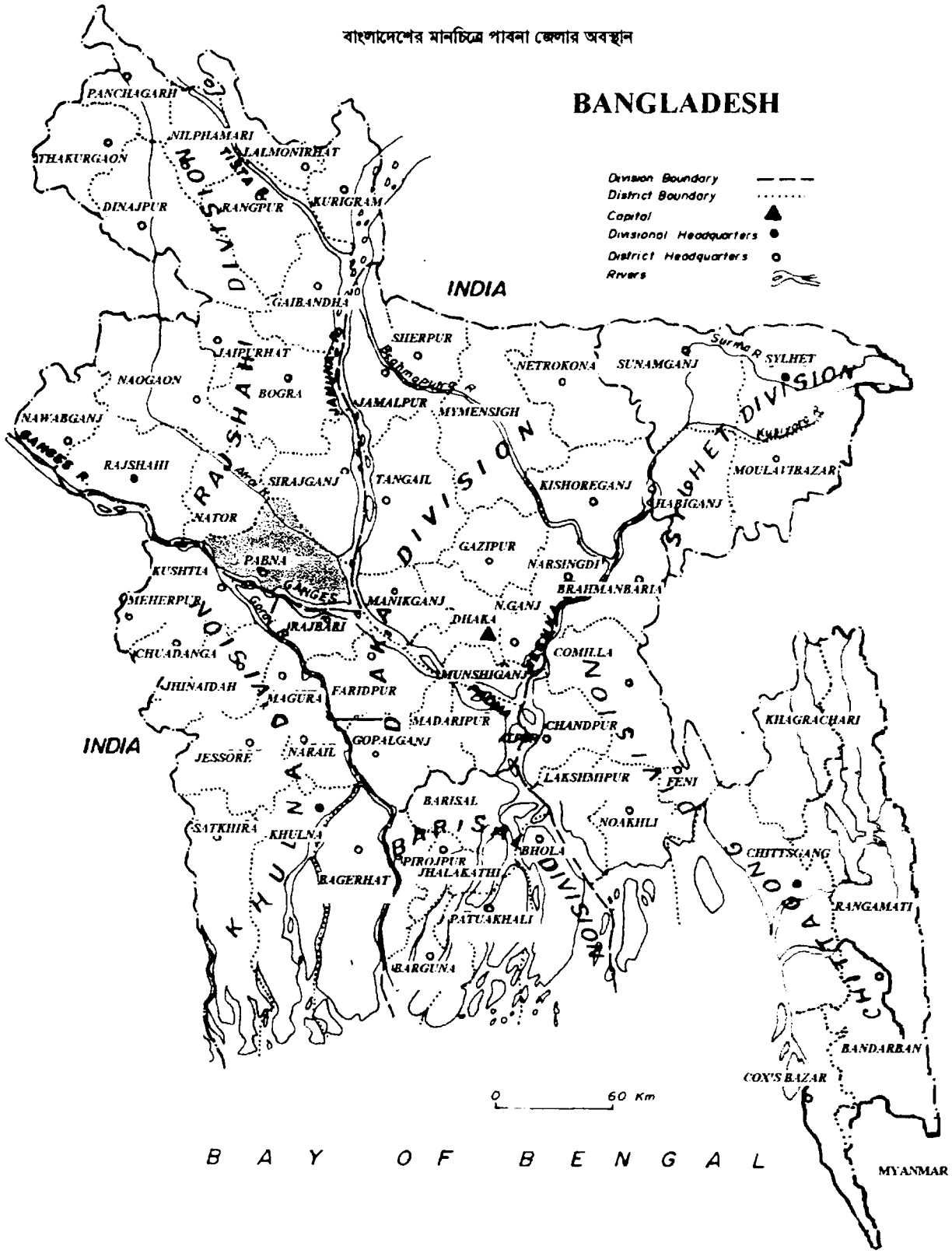

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র : ২

পাবনা জেলা

পরিবর্তিত সীমারেখা (১৮২৮-১৮৭১ খ্রি.)

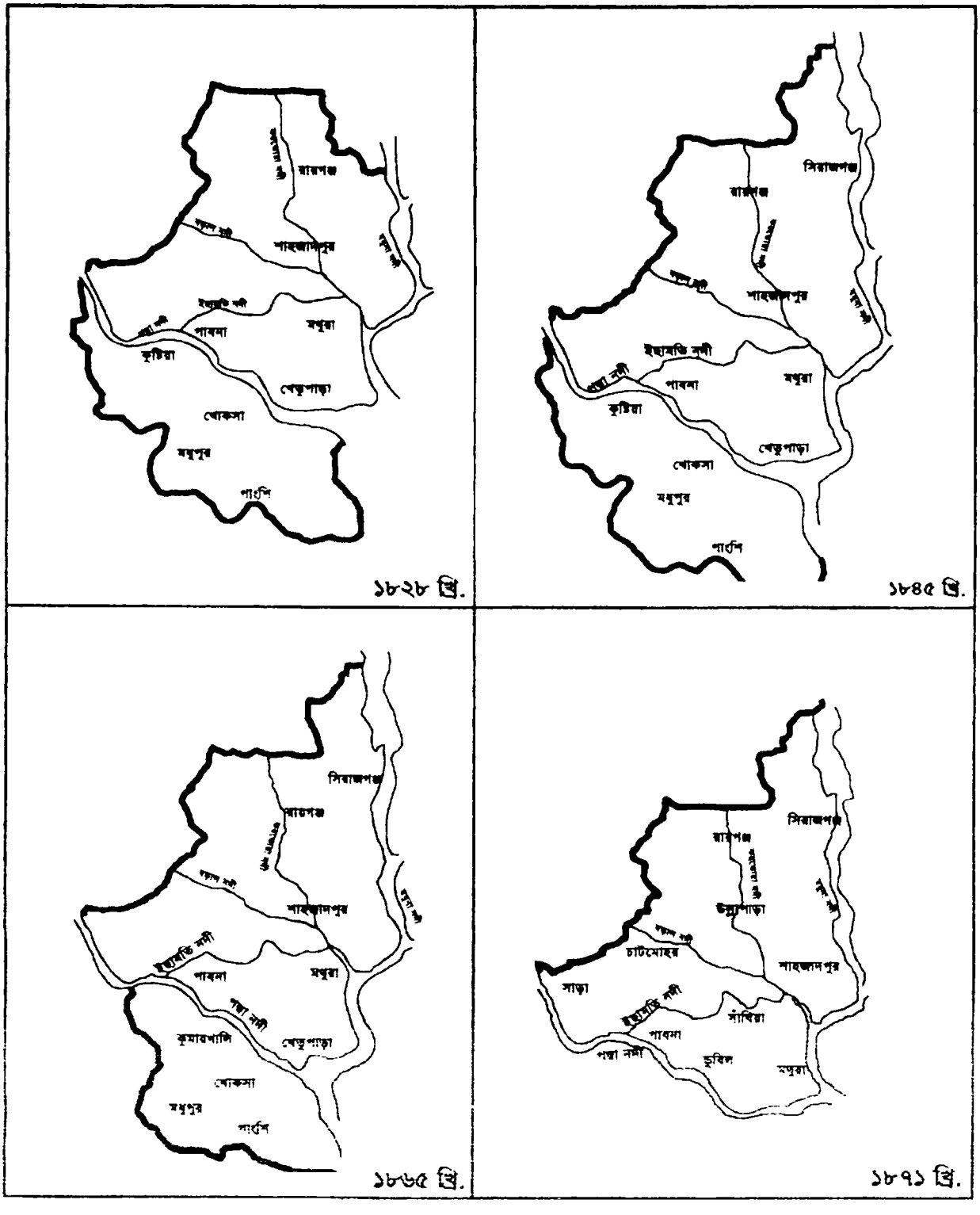

Collection from National Library Calcutta এর অনুসরণে পুনর্অঙ্কিত

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র : ৩

বৃহত্তর পাবনা জেলা

মানচিত্র : ৪

পাবনা জেলা (নবগঠিত)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলায় মুঘল ও ঔপনিবেশিক আমলের
নির্মিত স্থাপত্যের তালিকা

১ চাটমোহর শাহী মসজিদ
২. বালুচরা গম্বুজ ঘর
৩. পাইকপাড়া মসজিদ
৪. কুতুবশাহের মাজার
৫. ভাড়ারা শাহী মসজিদ
৬. জোড়-বাংলা মন্দির
৭. বেরোয়ান মসজিদ
৮. মৃধার মসজিদ
৯. খানবাড়ি মসজিদ
১০. ভাঙ্গুড়া মসজিদ
১১. মিরাজপুর চৌধুরীবাড়ি মসজিদ
১২. সাদুল্লাহপুর মসজিদ
১৩ দুলাই মসজিদ
১৪. শেঠের বাংলা
১৫. বোথর শিব মন্দির
১৬. জ্যোতির্ময়ের মন্দির
১৭ বিশ্বাসবাড়ি মন্দির
১৮. ঠাকুরবাড়ি মঠ
১৯ নেহালপাড়া মঠ
২০ গন্ধর্ব মন্দির
২১.গোসাইবাড়ি মন্দির
২২. হেমরাজপুর শিব মন্দির
২৩. হেমরাজপুর দুর্গা মন্দির
২৪. গণেশ মন্দির
২৫. পাবনা পঞ্চরত্ন মন্দির
২৬.পাবনা তান্ত্রিক মন্দির
২৭ তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির
২৮. তাঁতীবন্দ একরত্ন মন্দির
২৯. তাঁতীবন্দ শিব মন্দির
৩০. দুলাই জমিদারবাড়ি
৩১. তাঁতীবন্দ জমিদারবাড়ি
৩২. শিতলাই জমিদারবাড়ি
৩৩. তাড়াশ রাজবাড়ি
৩৪. কাশেমীনাথ রাজবাড়ি
৩৫. মল্লিকচক কাজিপাড়া জোড়-বাংলা
৩৬ জোড় বাংলা বাংলোঘর

মানচিত্র : ৫

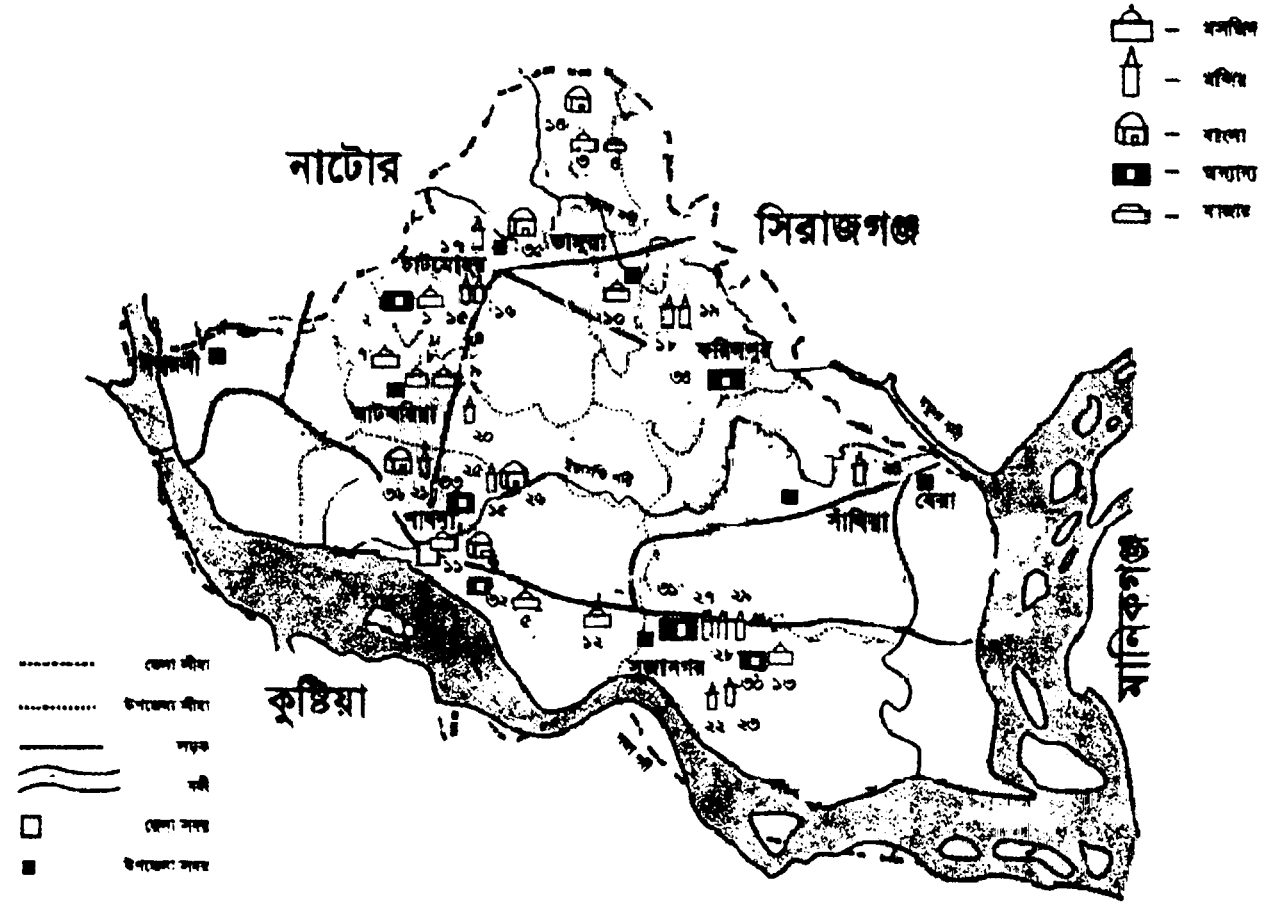

পাবনা জেলা
ঐতিহাসিক নিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি-নকশা

Dhaka University Institutional Repository

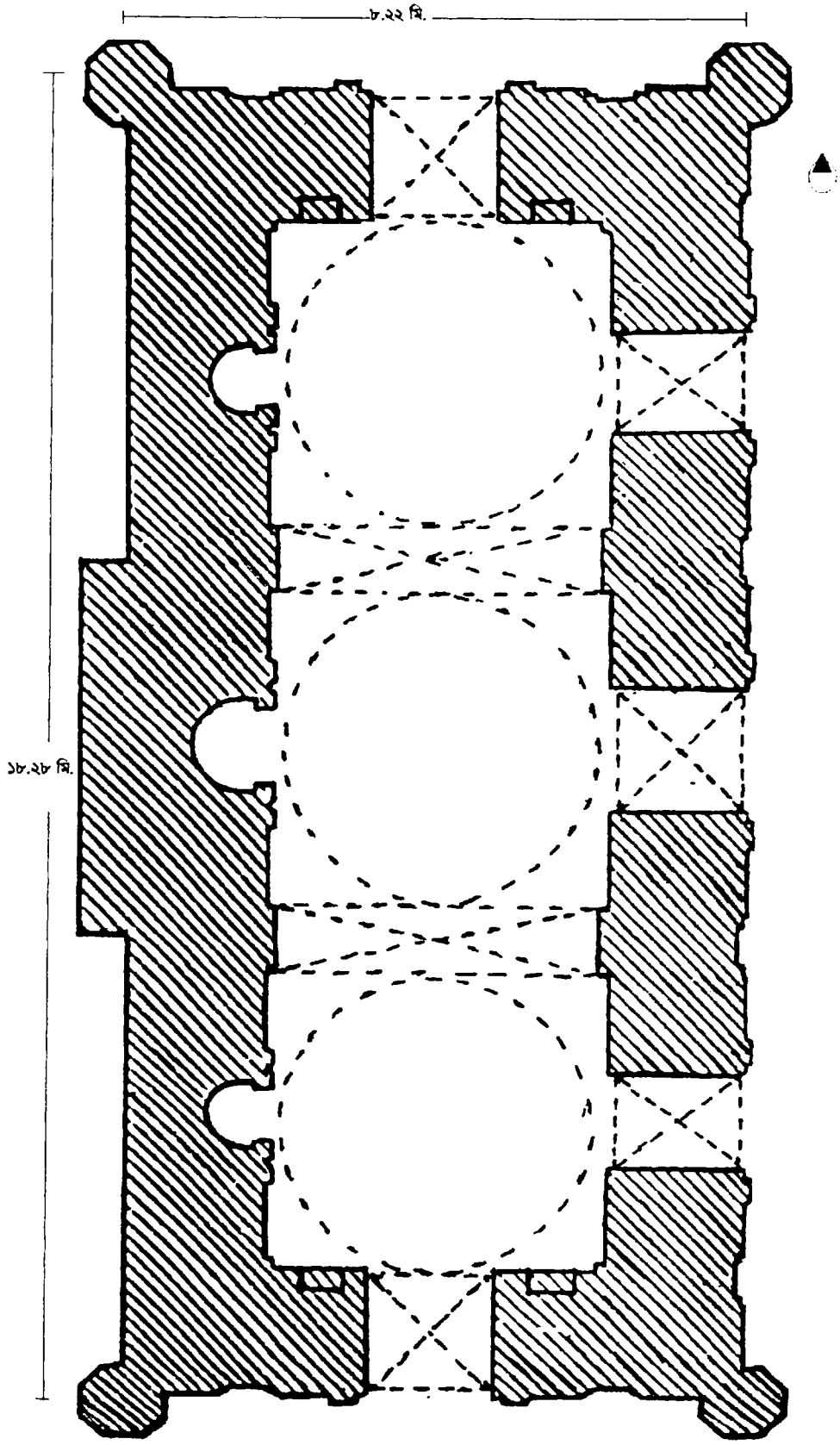

১.ভূমি-নকশা: চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

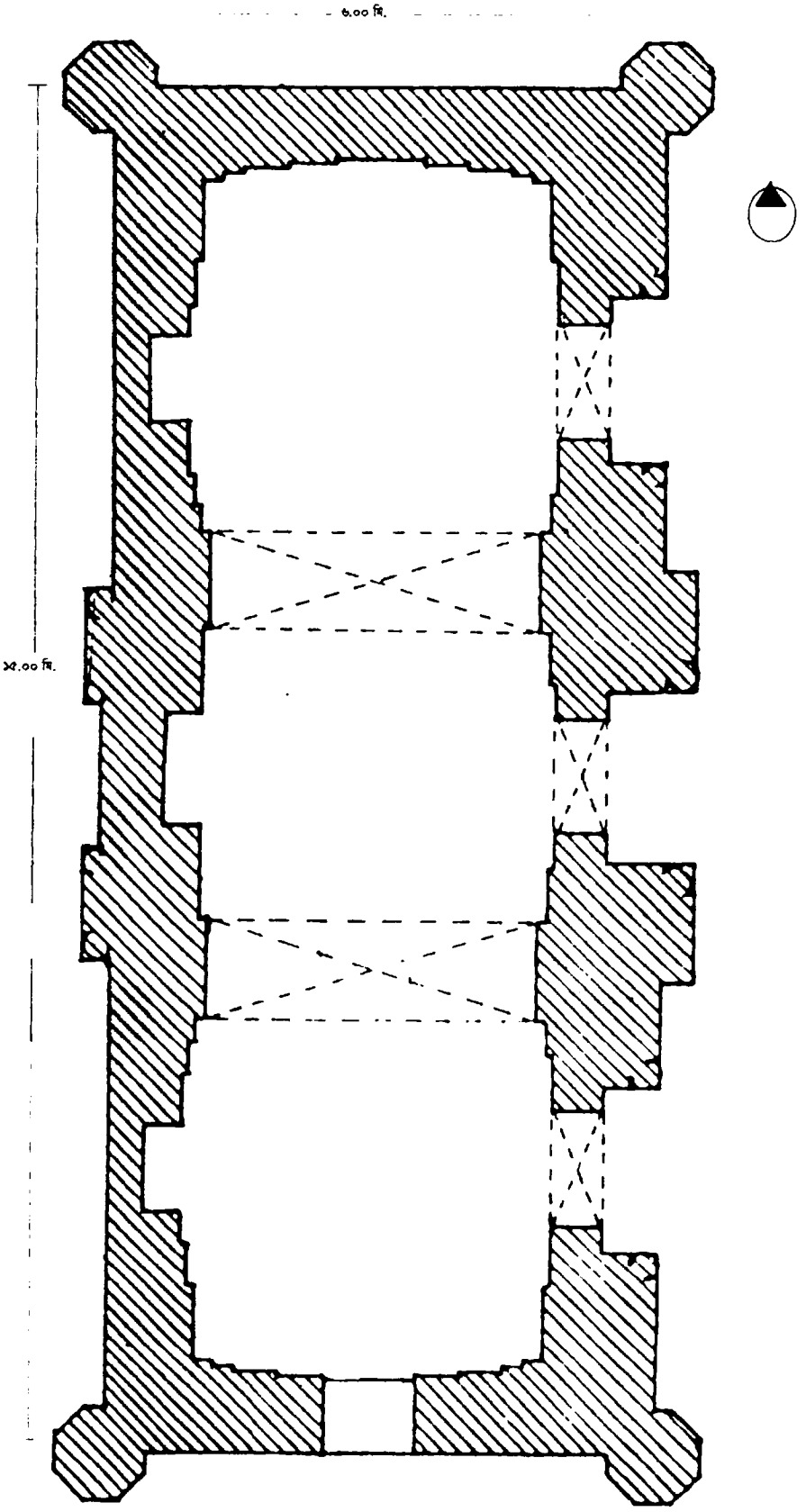

২.ভূমি-নকশা: ভাড়ারা জামে মসজিদ, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

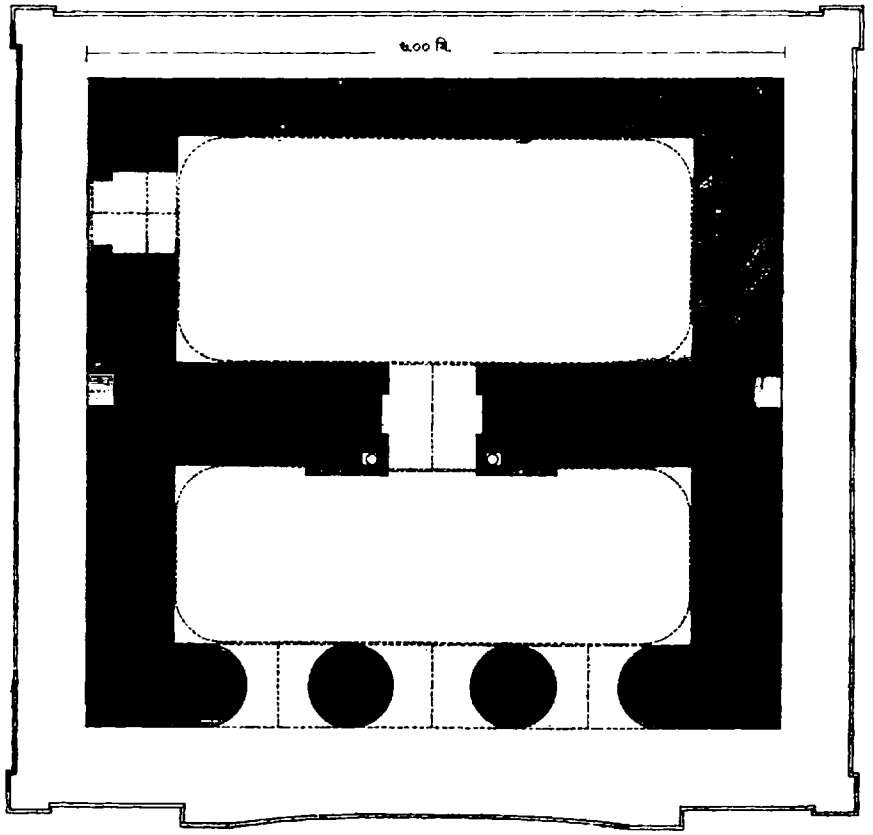

৩.ভূমি-নকশা: জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

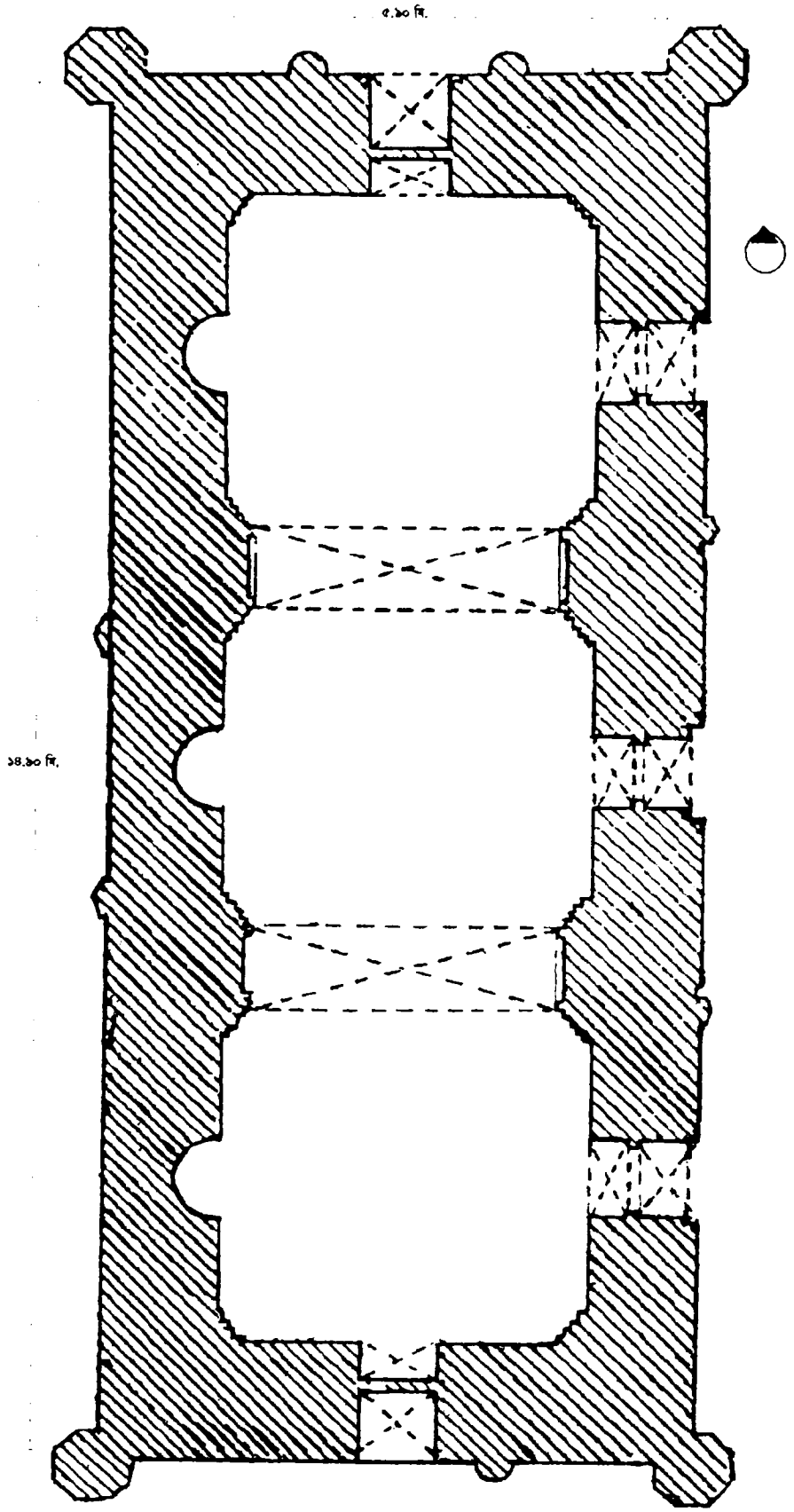

৪.ভূমি-নকশা: বেরোয়ান মসজিদ, আটঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

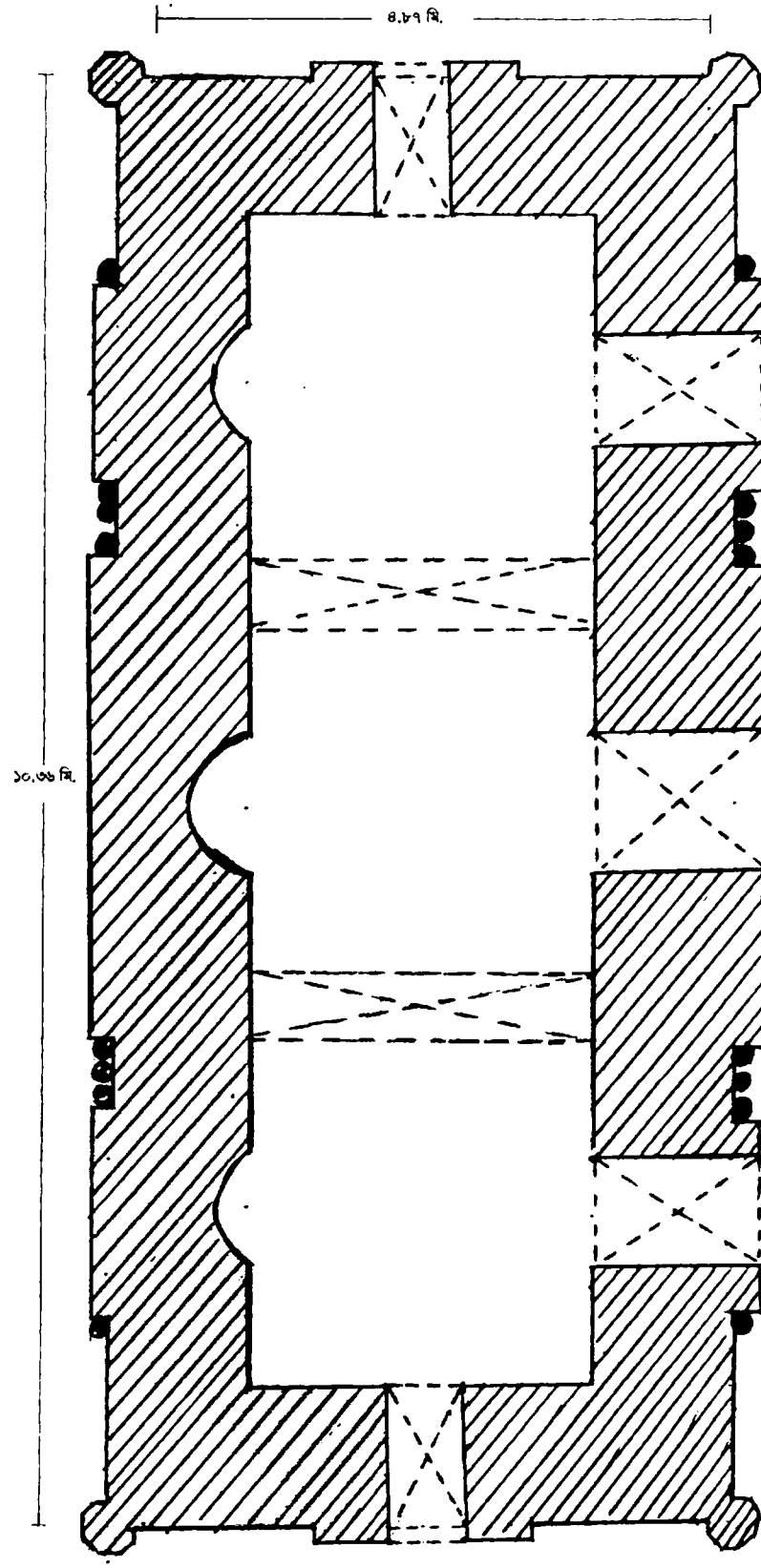

৫.ভূমি-নকশা: সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

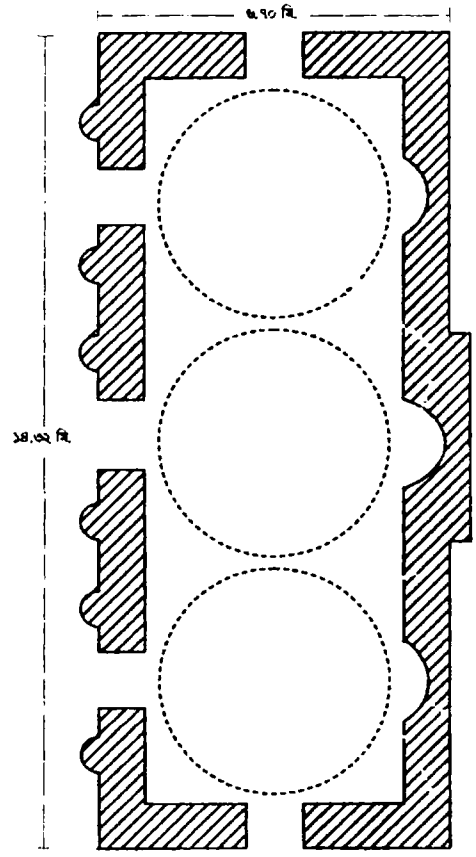

৬.ভূমি-নকশা: মুলাই জামে মসজিদ, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

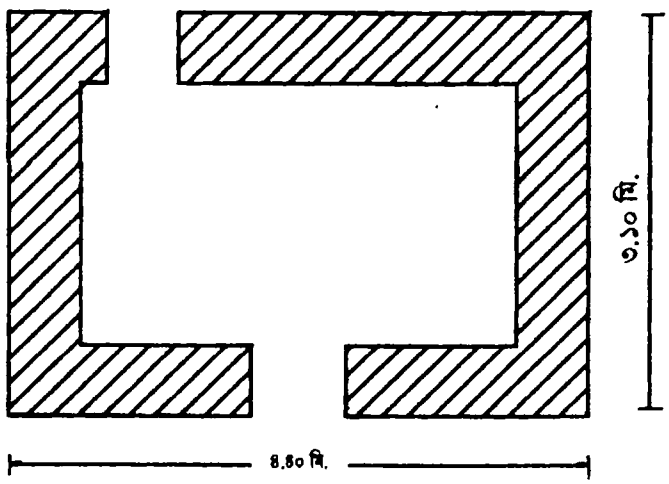

৭.ভূমি-নকশা: শেঠের বাংলা মন্দির, হাভিরাল, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

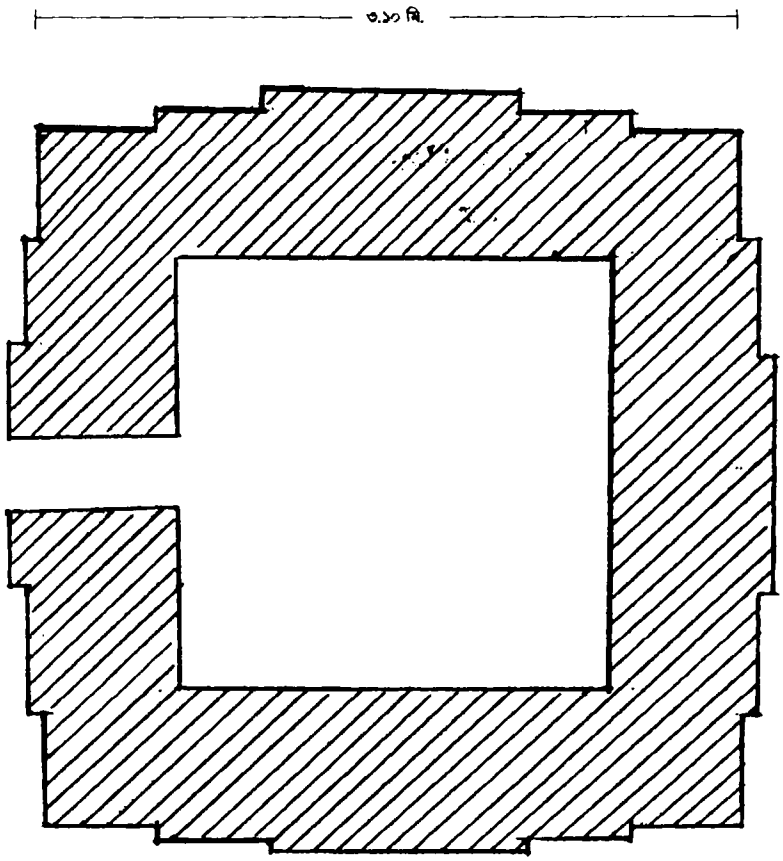

৮.ভূমি-নকশা: বোঁথর শিব মন্দির, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

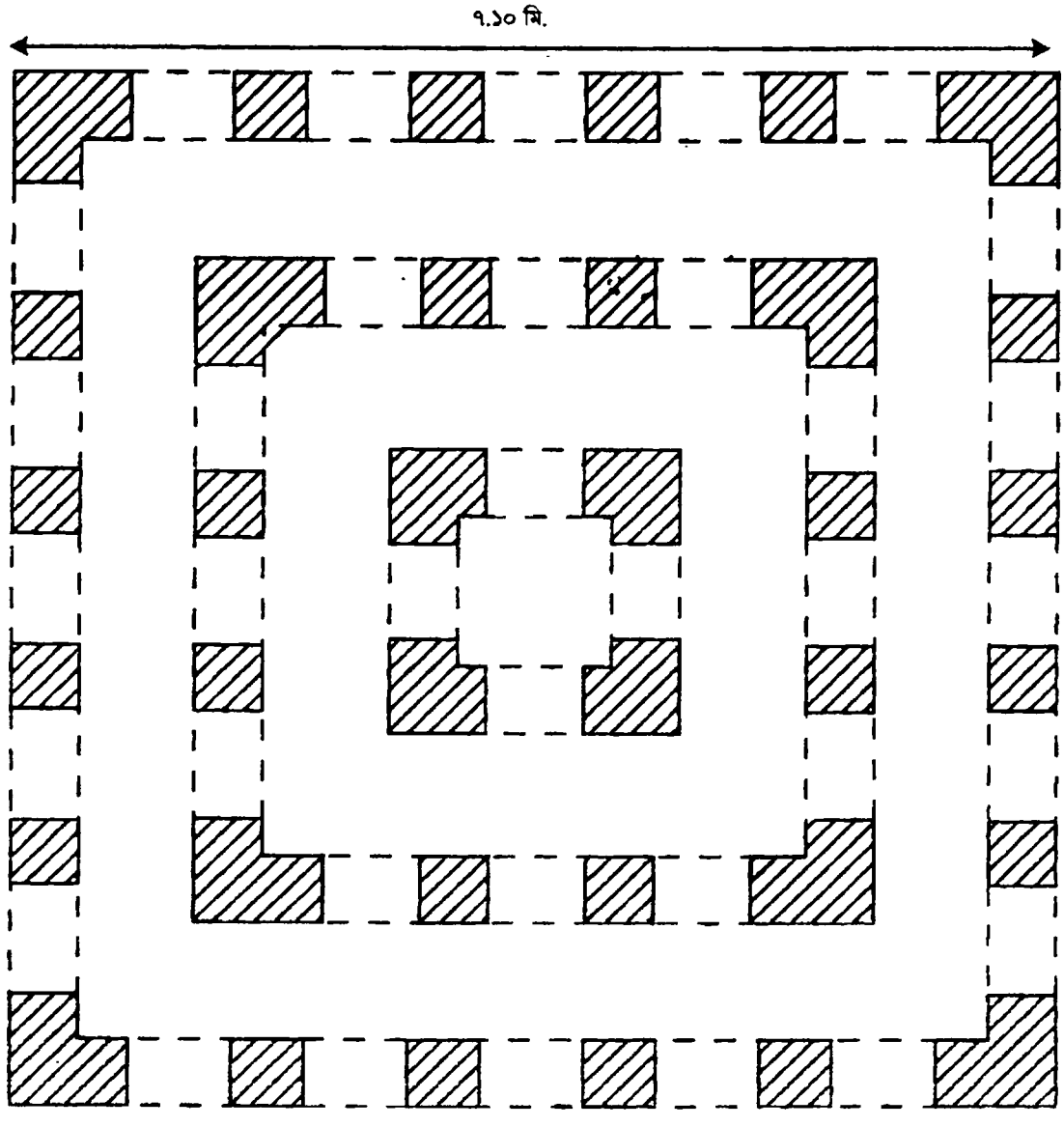

৯.ভূমি-নকশা: তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১: চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর

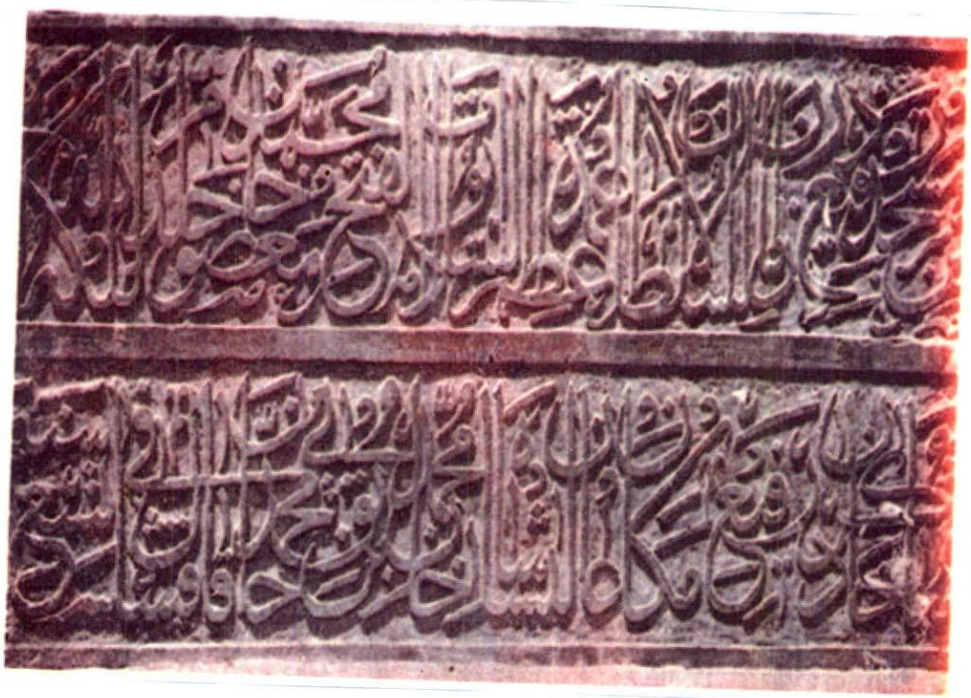

চিত্র ২: শিলালিপি, চাটমোহর শাহী মসজিদ, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩: বালুচর গম্বুজ ঘর, চাটমোহর

চিত্র ৪: পাইকপাড়া মসজিদ, হান্ডিয়াল, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

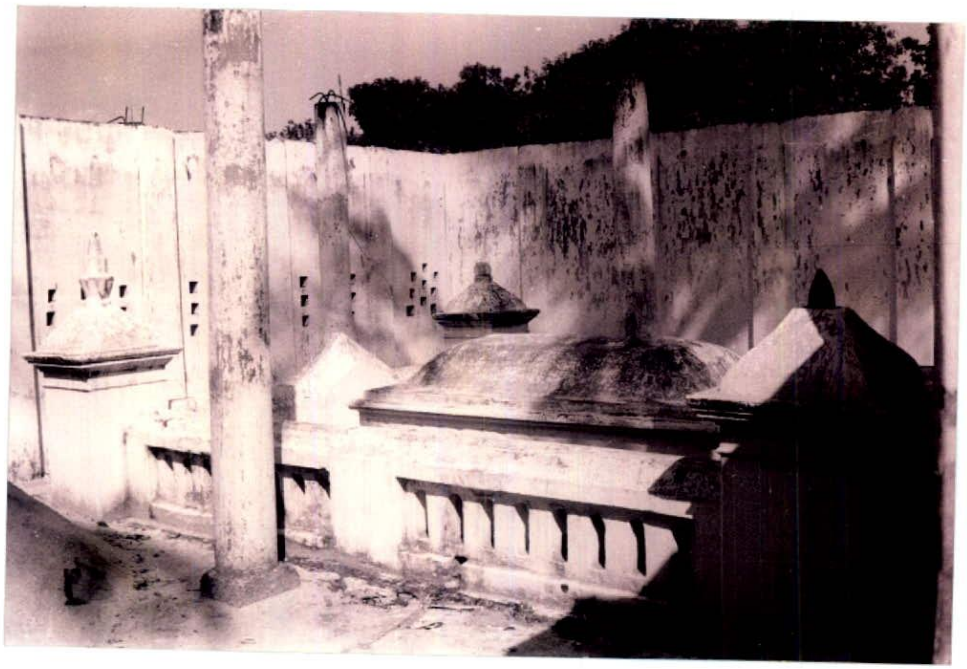

চিত্র ৫: বুড়া পীরের মাজার, হান্ডিয়াল চাটমোহর

চিত্র ৬: ভাড়ারা শাহী মসজিদ, দোগাছি, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭: দোচালা প্রবেশপথ, ভাড়ারা শাহী মসজিদ

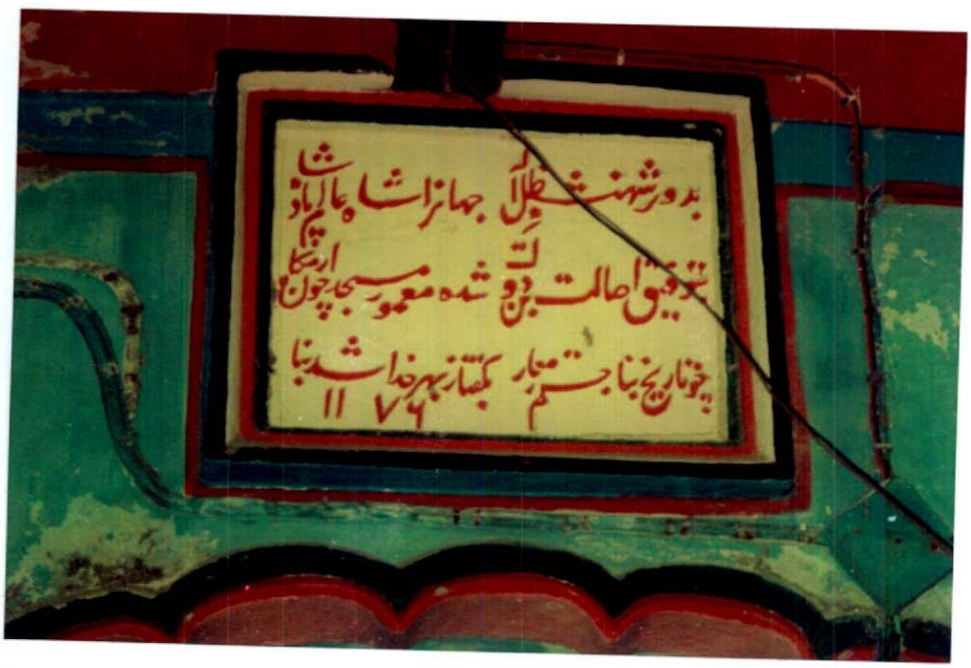

চিত্র ৮: শিলালিপি, ভাড়ারা শাহী মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

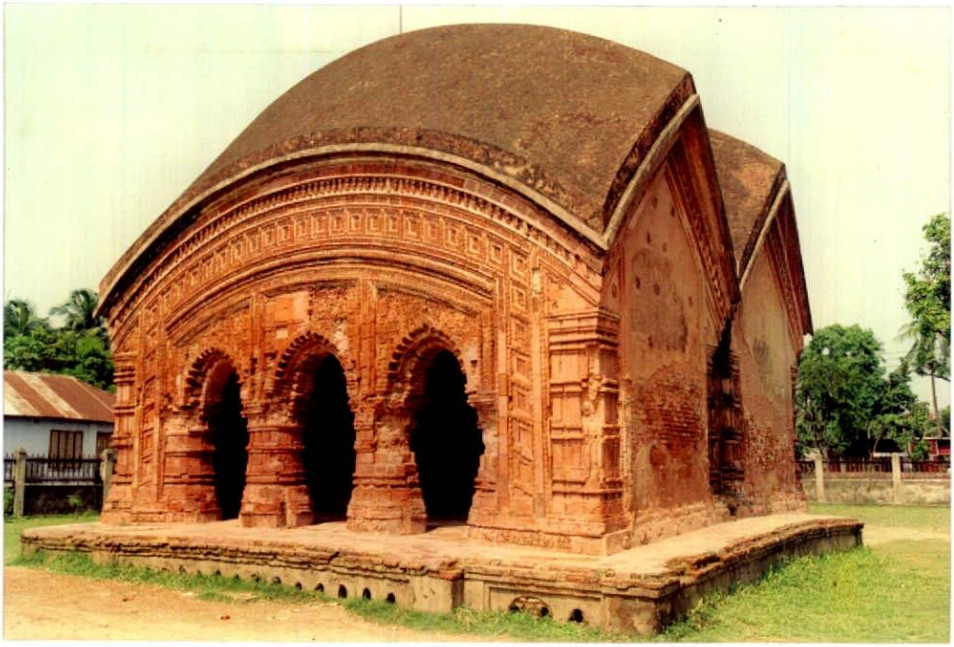

চিত্র ৯: জোড়-বাংলা মন্দির, পাবনা সদর

চিত্র ১০: অলংকরণ, জোড়-বাংলা মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১১: বেরোয়ান মসজিদ, আটঘরিয়া

চিত্র ১২: শিলালিপি, বেরোয়ান মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩: মৃধার মসজিদ, আটঘরিয়া

চিত্র ১৪: খানবাড়ি মসজিদ, আটঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

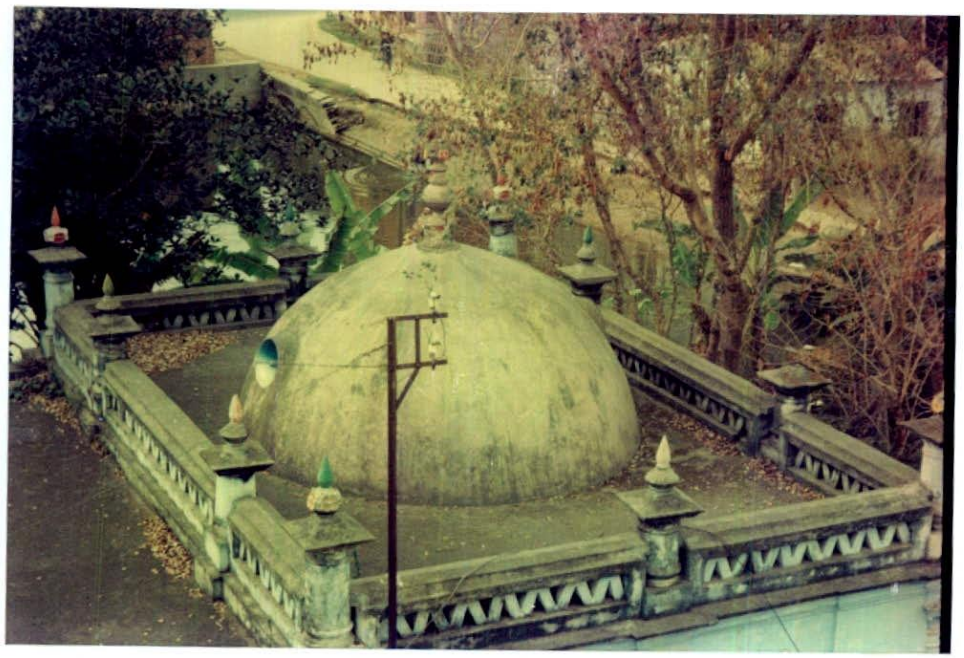

চিত্র ১৫: দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ, পাবনা সদর

চিত্র ১৫ক: মিহরাবের পিছনের অলংকরণ, দিলালপুর চৌধুরীবাড়ি জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৬: সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ, পাবনা সদর

চিত্র ১৭: শিলালিপি, সাদুল্লাহপুর জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৮: দুলাই জামে মসজিদ, সুজানগর

চিত্র ১৯: শিলালিপি, দুলাই জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২০: শেঠের বাংলা মন্দির, হান্ডিয়াল, চাটমোহর

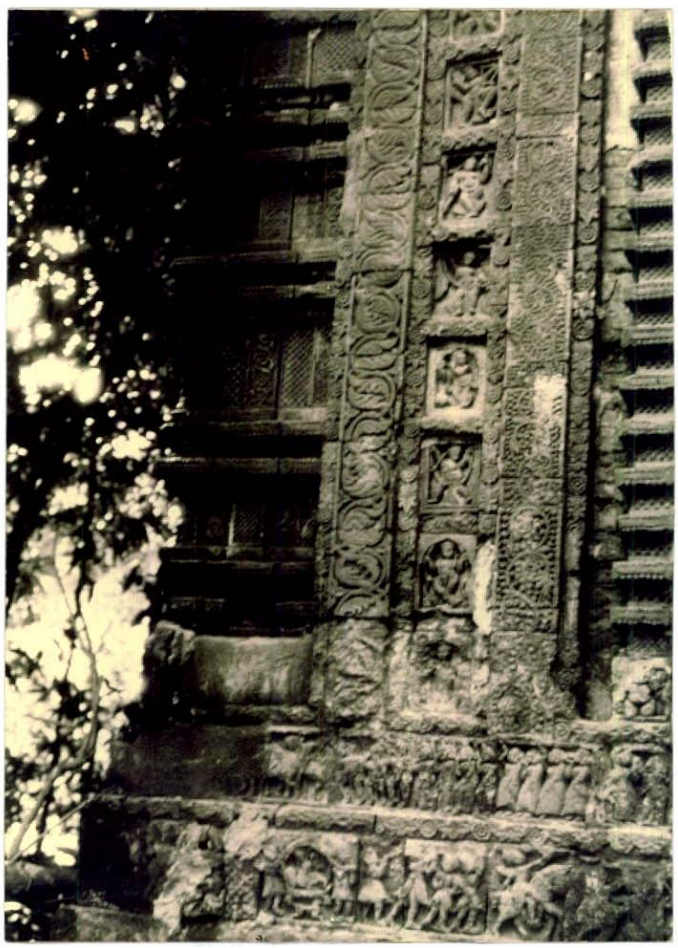

চিত্র ২১: অলংকরণ, শেঠের বাংলা মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২২: বোঁথর শিব মন্দির, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

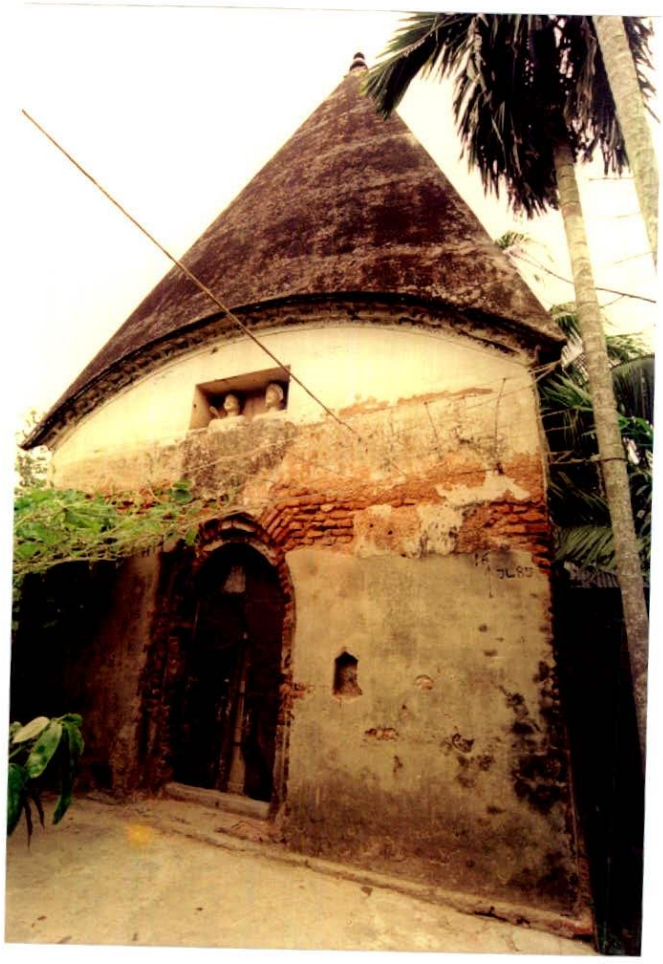

চিত্র ২৩: কুমারপাড়া বৈদ্যনাথের মন্দির, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

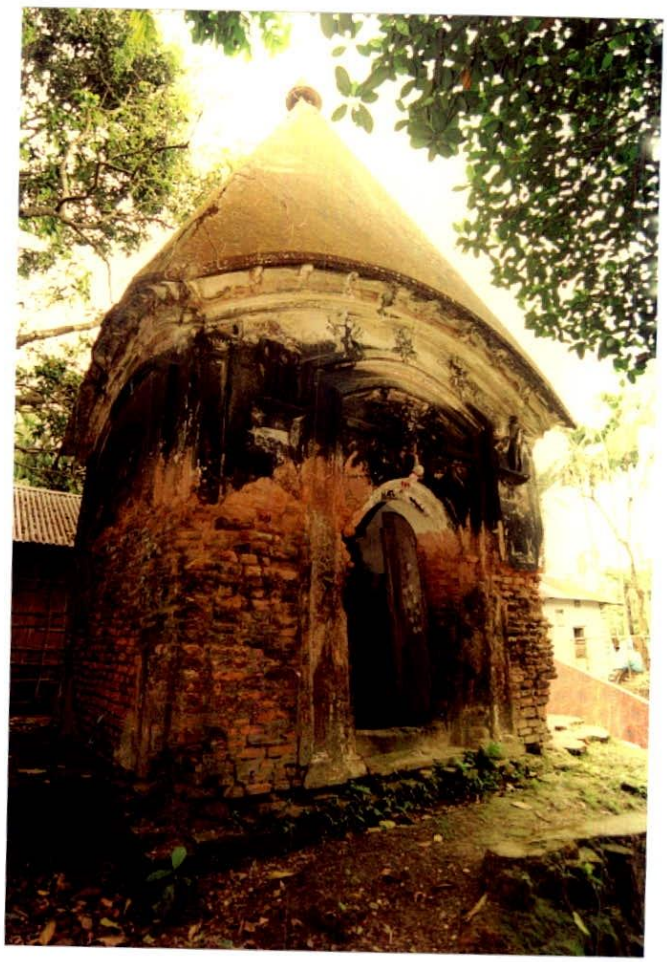

চিত্র ২৪: বিশ্বাসবাড়ি মন্দির, চাটমোহর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৫: ঠাকুরবাড়ি মঠ, ফরিদপুর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৬: নেছড়াপাড়া মঠ, ফরিদপুর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৭: গোসাইবাড়ি মন্দির, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৮: হেমরাজপুর শিব মন্দির, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৯: গণেশ মন্দির, সাথিয়া

চিত্র ৩০: পয়দা পঞ্চরত্ন মন্দির, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩১: পয়দা আহ্নিক মন্দির, পাবনা সদর

চিত্র ৩২: তাঁতীবন্দ নবরত্ন মন্দির, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

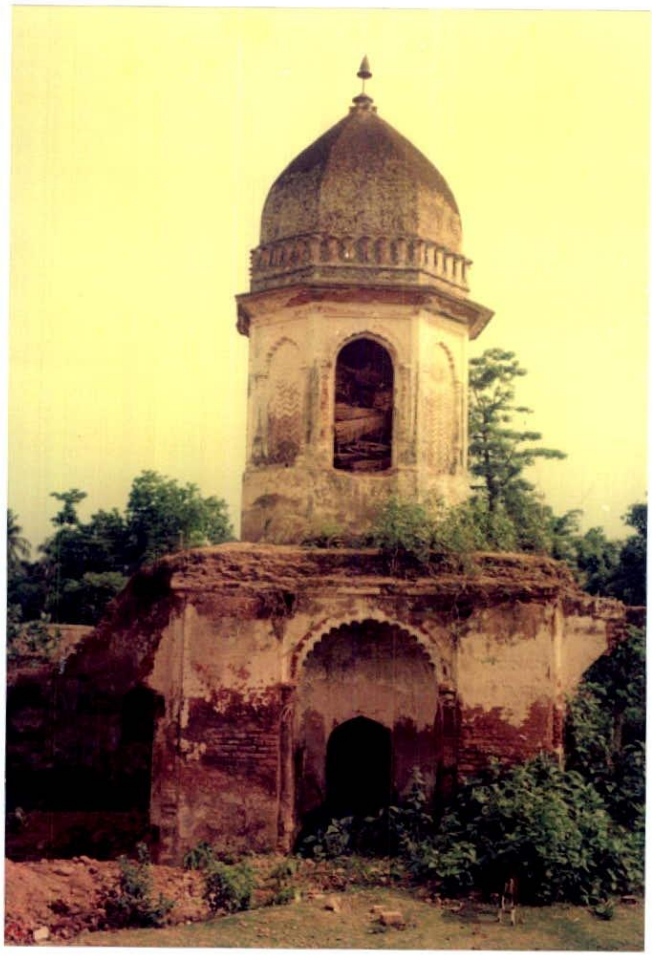

চিত্র ৩৩: তাঁতীবন্দ একরত্ন মন্দির, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৪: তাঁতীবন্দ শিব মন্দির, সুজানগর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৫: দুলাই জমিদারবাড়ি, সুজানগর

চিত্র ৩৬: শিতলাই জমিদারবাড়ি, পাবনা সদর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৭: তাড়াশ রাজবাড়ি, পাবনা সদর

চিত্র ৩৮: বনওয়ারী নগর রাজবাড়ি, ফরিদপুর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৯: জোতকলসা বাংলাঘর, আটঘরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

---------- *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, রাজশাহী, আই.বি.এস, ১৯৯২

---------- *মুর্শিদকুলী খান ও তার যুগ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

আহমদ, সালাহউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩ খন্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

খালেকুজ্জামান, মোঃ (সম্পা.), *বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন*, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭

চক্রবর্তী, রতন লাল. *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

জাহেদী, মনোয়ার হোসেন (সম্পা.), *কালের বলয়ে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০*, পাবনা, অন্নদা গোরিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯১

তরফদার, ম র, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

নাথান, মির্জা. *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী (অনু,), ৩ খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫-৮৯

নির্মল সিংহ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলায় ভ্রমন*, কলকাতা, শৈব প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৭ (তৃতীয় সংস্করন)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

---------- *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, রাজশাহী, আই.বি.এস, ১৯৯২

---------- *মুর্শিদকুলী খান ও তার যুগ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

আহমদ, সালাহউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩ খন্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

খালেকুজ্জামান, মোঃ (সম্পা.), *বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন*, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭

চক্রবর্তী, রতন লাল. *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

জাহেদী, মনোয়ার হোসেন (সম্পা.), *কালের বলয়ে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, শতবর্ষ স্মরণিকা ১৯৯০*, পাবনা, অন্নদা গোরিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯১

তরফদার, ম র, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

নাথান, মির্জা. *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী (অনু,), ৩ খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫-৮৯

নির্মল সিংহ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলায় ভ্রমন*, কলকাতা, শৈব প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৭ (তৃতীয় সংস্করন)

Dhaka University Institutional Repository

মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আ কা মো. যাকারিয়া (অনু.) , ঢাকা, বাংলা একাডেমী

মুখপাধ্যায়, সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দুশোবছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলকাতা, ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৯৮ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

---------- বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব(১২০৪-১৩৩৮), কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৮

বদরুদ্দোজা, চৌধুরী মোহাম্মদ, *জেলা পাবনার ইতিহাস,* পাবনা, লেখক স্বয়ং, ১৯৮৬

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারস, পাবনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

বেগম, আয়শা, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, ইউ.জি.সি., ২০০২

মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১

মিছের, কাজী মো., *বগুড়া ইতিহাস*, বগুড়া,

মিত্র, সতীশ চন্দ্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, খুলনা, রূপান্তর, ২০০১ (পূনর্মুদ্রণ)

যাকারিয়া, আ কা মো. *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪

রহমান, সুফি মুস্তাফিজুর (সম্পা), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

রহিম,এম.এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

রায়, নীহারঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ (বাং)

সরকার,ডি.সি., *পাল সেন যুগের বংশ চরিত*, কলকাতা, সলুদ্যালোক, ১৯৮২

সাহা, রাধা রমন, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, পাবনা , ১৩৩০ (বাং)

সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও আন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, রাজশাহী অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

হামিদ, এম. এ. *চলন বিলের ইতিকথা*, পাবনা, আমাদের দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭

হোসেন এ.বি. এম. (সম্পা.), *স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-২, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

হোসেন, জয়নাল, *ঠাকুর শম্ভুচাঁদ*, পাবনা, ১৯৯৭

প্রবন্ধ

বেগম, আয়শা, চাটমোহর শাহী মসজিদঃ বাংলার স্থাপত্যশিল্পে যুগসন্ধিলগ্নের নিদর্শন, *শিল্পকলা*, ষষ্ঠদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯২

---------- পাবনার জোড় বাংলা মন্দির, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চদশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৭

ম্যাক্কাচিয়ন, ডেভিড, পূর্ব বাংলার মন্দির, *ইতিহাস*, দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৩৭৫

হোসেন, এ.বি. এম., সুলতানী বাংলার স্থাপত্যশিল্প – একটি পর্যালোচনা, *ইতিহাস*, ১০ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৮৩

রহমান, মকসুদুর , চিরস্থায়ী বন্দবস্তের প্রতিক্রিয়া ও রাণী ভবানীর রাজ্য নাশঃ একটি সমীক্ষা, *ইতিহাস*, একাবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৩৯৪

ইংরেজী গ্রন্থ

Ahmed, Nazimuddin, *Discover the Monuments of Bangladesh*, Dhaka: University Press, 1984.

Buildings of the British Raj in Bangladesh, Dhaka: University Press, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed, Shamsud-Din, *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, Rajshahi, Varendra Research Museum, 1960

Asher, C. B., *Architecture of Mughal India*, Cambridge University Press, 1992

Bangladesh Archaeology, No. 1, Nazimuddin Ahmed(ed.), The Department of Archaeology and Museum, Dacca, 1979.

Bari, Muhammad Abdul, Mughal Mosque types in Bangladesh: Origins and Development (unpublished Ph. D. thesis), IBS, Rajshahi University, 1989

Begum, Ayesha, Forts in Medieval Bengal: an Architectural Study (unpublished Ph.D. Thesis), Rajshahi, IBS, 1992

Beveridge H. (trans.), *Akbarnama*, by Shaikh Abul Fazl (d. 1602), 3 vols., Delhi, M.S. Kumar, 1973(reprint).

Blockmann H. (trans.), *Ain-i-Akbari*, by Shaikh Abul Fazl (d.1602), Vol. I, Calcutta, Asiatic Society, 1873.

Brown, Percy, *Indian Architecture: Islamic Period*, Bombay, Taraporevala, 1968 (5th edition)

Cunningham, Alexander, *Archaeological Survey of India Report of Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon*, Vol. XV, Delhi, Rahul Publishing House, 1994 (reprint, first published in 1882).

Dani, A. H., *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961

Datta, Bimal Kumar, *Bengal Temples*, New Delhi, 1975

Dhaka University Institutional Repository

Eaton, Richard M, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760*, Delhi, Oxford University Press, 1994

Epigraphia Indica.: Arabic and Persian Supplement, 1975, edited by, Z.A. Desai, New Delhi, ASI, 1983

Gupta, Parmeshwari lal, *Coins and History of Medieval India*, Compiled & edited by Sanjay Garg, Delhi, Rahul Publishing Honse, 1997

Hasan, Perween, *Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh*, London and New York, I. B. Tauris, 2007

Hasan, S.M., *Muslim Monuments of Bangladesh*, 2nd edition Dacca, Islamic Foundation of Bangladesh, 1980

Haque, Enamul, *The Art Heritage of Bangladesh*, Dhaka, ICSBA, 2007

Haque, Saif Ul and others (ed.), *Pundranagar to Sherebanglanagar: Architecture in Bangladesh.* Dhaka: Chatana Sthapatya Unnoyon Society, 1997

Haque, Zulekha, *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal: Portrayal of a Society*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1980

Imamuddin, Abu H. (ed.), *Architectural Conservation Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1993

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh (1704- 1971)*, 3 vols, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1997

Karim, Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of*

Dhaka University Institutional Repository

Bengal, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh,1992

---------- *History of Bengal : Mughal Period*, Vol-1 & 2, Rajshahi, Institute of Bangladesh Studies, 1992 & 1995

Khan, Nurul Islam (ed.), *Bangladesh District Gazetteers, Pabna*, Dacca, Superintendent, Bangladesh Government Press, 1978

List of the Ancient Monuments in Benga,. Revised and Corrected Up to 31st August 1895, Prepared by the Government of Bengal, Public Works Department. Culcatta, Bengal Secretariat Press, 1896.

List of Protected Monuments and Mounds in Bangladesh. Dhaka, Directorate of Archaeology, GOB, 1970

Majumder N.G., *Inscriptions of Bengal*, vol.3, Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929

Majumder R. C. (ed.), *The History of Bengal, Volume I*, Dacca, The University of Dacca, 1943.

McCutchion, David J., *Late Mediaeval Temples of Bengal: Origin and Classification*, Calcutta, The Asiatic Society, 1972

Michel, George. (ed.), *Brick Temples of Bengal: From the Archives of David McCutchion.* Prinston University Press, 1983

Michell George (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal*, Paris, UNESCO, 1984

Protected Monuments and Mounds in Bangladesh, Dacca, Department of Archaeology and Museums , 1975

Dhaka University Institutional Repository

Nilsson, Sten, *European Architecture in India, 1750-1850*, London, Faber & Faber, 1968

OMalley, L.S.S. (ed.), *Bengal District Gazetteers (Pabna)*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1923

Salim, Ghulam Muhammad, *Riyazu-s-Salatin*, Trans. by Abdus Salam, Delhi, Idarah-i Adabiyat-i Delhi, 1975(reprint)

Sarkar, Jadunath (ed.), *The History of Bengal*, vol. 2, Dacca, University of Dacca Press, 1948

Saraswati, S.K., *The Architecture of Bengal, Book-1*, Calcutta: G. Bharadwaj, 1976.

Selected Articles

Alamgir, Md., The Jor Bangla Temple at Maheswarpasha, *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 38, no.2, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, December , 1993

Begum,Ayesha, Mughal Fort Architecture in Bengal with an Introduction to Some Important River Forts, *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh(Humanities)*, vol. 47, no.1, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2002

Bhattacharya, G., National Museum & Prasasti of Pahila, *Journal of Bengal Art* Vol. 2, Dhaka, ICSBA, 1997

Chakravarti, M., Bengali Temples and their General Characteristics, *Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, new Series vol. V, Calcutta, 1910

Dhaka University Institutional Repository

Hasan, Perween, Reflection on Early Temples Form of Eastern India, *Journal of Bengal Art*, vol. 2 , Dhaka, ICSBA, 1997

---------- Sultanate to Mughal: An Architecture of Transition in Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Humanities) , vol. 33, no. 2, December, 1988

Michell, George, The Revival of Temple architecture in Bengal in the late-sixteenth- century, *Journal of Bengal Art*, vol. 2, Dhaka, ICSBA, 1997

Sanz, Severine, Notes on the Rekha Deul in the Pre-Islamic Bengal, *Pratnattava*, vol. 6, Dhaka, 2000.